শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

(পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন)

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত।



দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রাবণ, ১৩২৬।

[মূল্য ৸৵০ আনা।

কলিকাতা,
১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,
উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে
স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা।

ঈশ্বরকৃপায়, আবির্ভাবপ্রয়োজনের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যজীবনের সবিস্তার বিবরণ প্রকাশিত হইল। নানা লোকের মুখ হইতে তাঁহার ঐকালের ঘটনাসমূহ অসম্বদ্ধভাবে শ্রবণ করিয়া আমাদিগের চিত্তে যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে পাঠককে তাহার সহিত পরিচিত করিতেই আমরা ইহাতে সচেষ্ট হইয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাগিনেয় শ্রীযুত হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত রামলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ আমাদিগকে ঘটনাবলীর সময় নিরূপণে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিলেও কোন কোন স্থলে উহার ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া গিয়াছে। কারণ, তাঁহারা আমাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পিতা ও অগ্রজ প্রভৃতির জন্মকোষ্ঠীসকল প্রদান করিতে পারেন নাই; কিন্তু "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মকালে তাঁহার পিতার বয়স ৬১।৬২ বৎসর ছিল," "তাঁহার অগ্রজ রামকুমার তাঁহা অপেক্ষা ৩১।৩২ বৎসরের বড় ছিলেন," এই ভাবে সময় নিরূপণ করিয়া বলিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম সম্বন্ধে যে সন ও তারিখ আমরা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিলাম তৎসম্বন্ধে যে, কোন ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা নাই ইহা পাঠক "মহাপুরুষের জন্মকথা" নামক এই গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায় পাঠ করিয়া নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার নিজ উক্তি হইতেই আমরা উহা নিরূপণে সক্ষম হইয়াছি, সুতরাং ঐবিষয়ের জন্য তিনিই স্বরূপতঃ সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন

হইয়াছেন। গ্রন্থস্থ ঘটনাবলীর অনেকগুলিও আমরা তাঁহার নিজমুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের লীলাবলী লিপিবদ্ধ করিবার প্রারম্ভে আমরা তাঁহার বাল্য ও যৌবনের ঘটনাসমূহকে যে এত বিশদ এবং সম্বদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারিব এরূপ আশা করি নাই। সুতরাং যিনি মূককে বাগ্মী করিতে, এবং পঙ্গুকে বিশাল গিরি-উল্লঙ্ঘন-সামর্থ্য-প্রদানে সক্ষম একমাত্র তাঁহার কৃপাতেই উহা সম্ভবপর হইল ভাবিয়া আমরা তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করিতেছি। উপসংহারে ইহাও বক্তব্য যে পাঠক বর্ত্তমান গ্রন্থ পাঠ করিবার পরে "সাধকভাব" ও "গুরুভাব" গ্রন্থ পাঠ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মকাল হইতে সন ১২৮৭ সাল বা ইংরাজী ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনেতিহাস ধারাবাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন। ইতি—

প্রণত

গ্রন্থকার।

সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

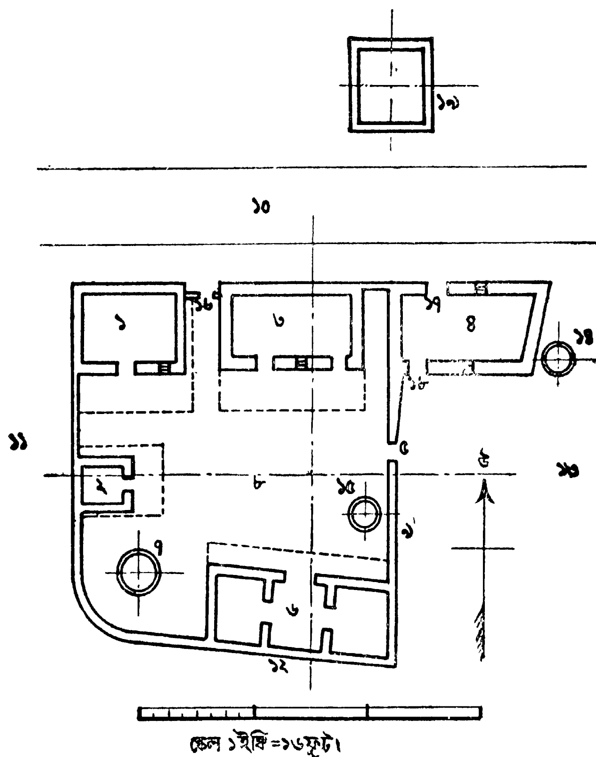
ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।



ঠাকুরের বাটীর নক্সা।



ঠাকুরের কামারপুকুরের বাটীর নক্সার পরিচয়।

১। পশ্চিম দিকের দক্ষিণদ্বারী ঘর। কামারপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুর এই ঘরে থাকিতেন। উহার বাহিরের মাপ—দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট ১০ ইঞ্চি; প্রস্থ ১২ ফুট ১০ ইঞ্চি। ভিতরের মাপ—দৈর্ঘ্য ১৩ ফুট, প্রস্থ ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি। ঘরের সম্মুখের দাওয়ার মাপ—দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট ১০ ইঞ্চি, প্রস্থ ৫ ফুট।

২। ৺রঘুবীরের পূর্ব্বদ্বারী ঘর। ১ নম্বর চিহ্নিত ঠাকুরের ঘরের দাওয়া হইতে ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি দক্ষিণে এই ঘর অবস্থিত। উহার বাহিরের মাপ—দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ৫ ইঞ্চি, প্রস্থ ৮ ফুট ৫ ইঞ্চি। সম্মুখের দাওয়ার মাপ—দৈর্ঘ্য ৯ ফুট ১০ ইঞ্চি, প্রস্থ ৪ ফুট।

৩। ১ নম্বর চিহ্নিত ঘর হইতে ৪ ফুট ৪ ইঞ্চি দূরে পূর্ব্ব দিকে এই দক্ষিণ দ্বারী ঘর অবস্থিত। ইহার বাহিরের মাপ—দৈর্ঘ্য ২০ ফুট ৮ ইঞ্চি, প্রস্থ ১১ ফুট ৯ ইঞ্চি। ভিতরের মাপ—দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট ৮ ইঞ্চি, প্রস্থ ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি। সম্মুখের দাওয়ার মাপ—দৈর্ঘ্য ২০ ফুট ৮ ইঞ্চি, প্রস্থ ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি।

৪। ৩ নম্বর চিহ্নিত ঘরের ৩ ফুট ৭ ইঞ্চি দূরে পূর্ব্ব দিকে বৈঠকখানা ঘর। ইহার বাহিরের মাপ—উত্তর দিকের দেওয়ালের দৈর্ঘ্য ২২ ফুট ৮ ইঞ্চি, দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের দৈর্ঘ্য ১৯ ফুট ৫ ইঞ্চি, পূর্ব্ব পশ্চিম দিকের দেওয়ালের দৈর্ঘ্য ১২ ফুট ৪ ইঞ্চি। ভিতরের মাপ মেজের উত্তর দিকের দৈর্ঘ্য ১৮ ফুট ৫ ইঞ্চি; দক্ষিণ দিকের দৈর্ঘ্য ১৭ ফুট ৭ ইঞ্চি, প্রস্থ ৮ ফুট ২ ইঞ্চি। এই ঘরখানি সমচতুষ্কোণ নহে।

৫। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবার দ্বার। ইহা বৈঠকখানার পশ্চিম দক্ষিণ-কোন হইতে ৯ ফুট দক্ষিণে অবস্থিত। এই দরজা হইতে ১৩ ফুট দক্ষিণে রন্ধন-গৃহের দাওয়ার আরম্ভ। উক্ত দাওয়ার মাপ—দৈর্ঘ্য ২৫ ফুট, প্রস্থ ৪ ফুট। উহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত।

৬। রন্ধন-গৃহ। ইহা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দ্বারী দুইটী ঘরে বিভক্ত। ইহার বাহিরের মাপ—দৈর্ঘ্য ২৬ ফুট ৬ ইঞ্চি, প্রস্থ ১১ ফুট ২ ইঞ্চি।

৭। ৺রঘুবীরের (২ নম্বর চিহ্নিত) ঘরের দক্ষিণে গোলক চিহ্নিত স্থানে কয়েকটী পুষ্পবৃক্ষ।

৮। উঠান—পূর্ব্বে অবস্থিত প্রাচীর হইতে ৺রঘুবীরের গৃহের দাওয়ার নিম্ন পর্য্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্যের মাপ ৩২ ফুট এবং রন্ধন-গৃহের দাওয়ার নিম্ন হইতে উত্তরে অবস্থিত দাওয়ার নিম্ন পর্য্যন্ত প্রস্থের মাপ কোন স্থানে ১৭ ফুট ৬ ইঞ্চি ও কোন স্থানে ১৭ ফুট।

৯। পূর্ব্বদিকের প্রাচীর—বৈঠকখানার নৈঋ‌'ত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া রন্ধনগৃহের অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ইহার মাপ ৩৮ ফুট ৬ ইঞ্চি।

১০, ১১, ১২, ১৩। বাটীর চতুঃসীমা—উত্তরে ১০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা, পশ্চিম ও দক্ষিণে লাহাবাবুদের পতিত জায়গা, পূর্ব্বে লাহাবাবুদের ছোট পুষ্করিণী।

১৪। বৈঠকখানা ঘরের অগ্নিকোণে গোলক-চিহ্নিত স্থানে ঠাকুরের স্বহস্ত রোপিত আম্রবৃক্ষ।

১৫। রন্ধন-গৃহের উত্তরে গোলকচিহ্নিত স্থানে ঠাকুরের জন্মস্থান। পূর্ব্বে এই স্থানে ঢেঁকিশাল ছিল।

১৬। খিড়কি দরজা।

১৭। রাস্তার দিকে বৈঠকখানা প্রবেশের দরজা।

১৮। বাটীর ভিতরের দিকে বৈঠকখানা প্রবেশের দরজা।

১৯। যুগীদের শিবমন্দির।

☞ প্রতি ঘরের সম্মুখে···চিহ্নিত স্থানে ঐ ঘরের দাওয়া এবং |——| চিহ্নিত স্থানে জানালা বুঝিতে হইবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন।

অবতরণিকা।

ভারত ও তদিতর দেশসমূহের আধ্যাত্মিক ভাব ও বিশ্বাস-সকল তুলনায় আলোচনা করিলে, উহাদিগের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ উপলব্ধি হয়। দেখা যায়, ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুসকলকে ধ্রুবসত্য জ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিতে অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারত নিজ সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছে এবং ঐরূপ সাক্ষাৎকার বা উপলব্ধি-কেই ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বার্থের চরম সীমারূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছে। উহার সমগ্র চেষ্টা এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিকতায় চিরকালের জন্য রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

ধর্ম্মই ভারতের সর্ব্বস্ব।

ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়সকলে ঐরূপ একান্ত অনুরাগ কোথা হইতে উহাতে উপস্থিত হইল, একথার মূল অন্বেষণে বুঝিতে পারা যায় দিব্যগুণ এবং প্রত্যক্ষসম্পন্ন পুরুষ সকলের ভারতে নিয়ত জন্মগ্রহণ করাই উহার একমাত্র কারণ। তাঁহাদিগের বিচিত্র দর্শন ও অসাধারণ শক্তি-প্রকাশ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ এবং আলোচনা করিয়াই সে ঐ সকলে দৃঢ়বিশ্বাস এবং অনুরাগসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের জাতীয় জীবন ঐরূপে,

মহাপুরুষ-সকলের ভারতে প্রতিনিয়ত জন্মগ্রহণই ঐরূপ হইবার কারণ।

বহুপ্রাচীনকাল হইতে আধ্যাত্মিকতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়া, প্রত্যক্ষ ধর্ম্মলাভরূপ লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অভিনব সমাজ এবং সামাজিক প্রথাসকল সৃজন করিয়াছিল। জাতি এবং সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ প্রকৃতিগত গুণাবলম্বনে দৈনন্দিন কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া যাহাতে চরমে ধর্ম্ম লাভ বা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করিতে পারে, ভারতের সমাজ একমাত্র সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিয়ম এবং প্রথাসকল যন্ত্রিত করিয়াছিল। পুরুষানুক্রমে বহুকাল পর্য্যন্ত ঐসকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসাতেই ভারতে ধর্ম্মভাবসকল এখনও এতদূর সজীব রহিয়াছে, এবং তপস্যা, সংযম ও তীব্র ব্যাকুলতা-সহায়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই যে জগৎকারণ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাঁহার সহিত নিত্য-যুক্ত হইতে পারে, ভারতের প্রত্যেক নরনারী একথায় এখনও দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীভগবানের দর্শনলাভের উপরেই যে ভারতের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, একথা সহজেই অনুমিত হয়। ধর্ম্মসংস্থাপক আচার্য্যগণকে বৈদিক যুগ হইতে আমরা যে সকল পর্য্যায়ে নির্দ্দেশ করিয়াছি, সেই সকল বাক্যের অর্থ অনুধাবন করিলেই ঐ কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে, যথা,—ঋষি, আপ্ত, অধিকারী বা প্রকৃতি-লীন পুরুষ ইত্যাদি। অতীন্দ্রিয় পদার্থের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই যে তাঁহারা ঐ সকল নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন, একথা নিঃসন্দেহ। বৈদিক যুগের ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগের অবতার-

ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শনের উপরে ভারতের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। উহার প্রমাণ।

অবতরণিকা।

প্রথিত পুরুষসকলের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই পূর্ব্বোক্ত কথা সমভাবে বলিতে পারা যায়।

আবার বৈদিক যুগের ঋষিই যে, কালে, পৌরাণিক যুগে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বৈদিক যুগে মানব কতকগুলি পুরুষকে ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থসকল দৃষ্টি করিতে সমর্থ বলিয়া বুঝিতে পারিলেও, তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ঐ বিষয়ের শক্তির তারতম্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেককে একমাত্র 'ঋষি'-পর্য্যায়ে নির্দ্দেশ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কালে মানবের বুদ্ধি ও তুলনা করিবার শক্তি যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, ততই সে উপলব্ধি করিতে লাগিল, ঋষিগণ সকলেই সমশক্তিসম্পন্ন নহেন; আধ্যাত্মিক জগতে তাঁহাদিগের কেহ সূর্য্যের ন্যায়, কেহ চন্দ্রের ন্যায়, কেহ উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়, আবার কেহ বা সামান্য খদ্যোতের ন্যায় দীপ্তি প্রদানপূর্ব্বক জ্যোতিষ্মান্ হইয়া রহিয়াছেন। তখন ঋষিগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে মানবের চেষ্টা উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলিকে সে আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রকাশে বিশেষ সামর্থ্যবান্ বা ঐ শক্তির বিশেষ-ভাবে অধিকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল। ঐরূপে দার্শনিক যুগে কয়েকজন ঋষি 'অধিকারি-পুরুষ'-পর্য্যায়ে অভিহিত হইলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহবান সাংখ্যকার আচার্য্য কপিল পর্য্যন্ত ঐরূপ পুরুষসকলের অস্তিত্বে সন্দেহ করিতে পারেন নাই; কারণ, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষকে কে কবে সন্দেহ করিতে পারে? সুতরাং

ভারতে অবতারবিশ্বাস উপস্থিত হইবার কারণ ও ক্রম। সাংখ্যদর্শনোক্ত 'কল্পনিয়ামক ঈশ্বর।'

শ্রীভগবান্ কপিল ও তৎপদানুসারী সাংখ্যাচার্য্যগণের গ্রন্থে 'অধিকারি-পুরুষ'-সকলকে 'প্রকৃতি-লীন' পর্য্যায়ে অভিহিত হইয়া স্থান প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়া থাকে। ঐরূপ অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষসকলের উৎপত্তি বিষয়ে কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া তাঁহারা বলিয়াছেন—

পবিত্রতা, সংযমাদি গুণে ভূষিত হইয়া পূর্ণজ্ঞানলাভে সমর্থ হইলেও ঐরূপ পুরুষসকলের মনে লোককল্যাণসাধনবাসনা তীব্রভাবে জাগরিত থাকে, সেজন্য তাঁহারা অনন্ত মহিমামণ্ডিত স্বস্বরূপে কিয়ৎকাল লীন হইতে পারেন না; কিন্তু ঐ বাসনাবলে সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতির অঙ্গে লীন হইয়া তাঁহারা তাঁহার শক্তি-সমূহকে নিজ শক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন, এবং ঐরূপে ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া এক কল্পকাল পর্য্যন্ত অশেষ প্রকারে জনকল্যাণসাধনপূর্ব্বক পরিণামে স্বস্বরূপে অবস্থান করেন।

'প্রকৃতি-লীন' পুরুষসকলের মধ্যে শক্তির তারতম্যানুসারে, সাংখ্যাচার্য্যগণ আবার দুই শ্রেণীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা— 'কল্পনিয়ামক ঈশ্বর' ও 'ঈশ্বর-কোটি'।

ভক্তিযুগের বিরাট ব্যক্তিত্ববান্ ঈশ্বর।

দার্শনিক যুগের অন্তে ভারতে ভক্তিযুগের বিশেষভাবে আবির্ভাব হইয়াছিল। বেদান্তের তীব্র নির্ঘোষে ভারত-ভারতী তখন সর্ব্ব ব্যক্তির সমষ্টীভূত এক বিরাট ব্যক্তিত্ব-বান্ ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া কেবলমাত্র অনন্যভক্তি-সহায়ে তাঁহার উপাসনায় জ্ঞান এবং যোগের পূর্ণতাপ্রাপ্তিবিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্যদর্শনোক্ত 'কল্পনিয়ামক ঈশ্বরকে', তখন, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-

অবতরণিকা।

স্বভাববিশিষ্ট বিরাট ব্যক্তিত্ববান্ ঈশ্বরের আংশিক বা পূর্ণ প্রকাশে পরিণত করিতে বিলম্ব হইল না। ঐরূপেই পৌরাণিক যুগে অবতারবিশ্বাসের উৎপত্তি এবং বৈদিক যুগের বিশিষ্ট গুণশালী ঋষির ঈশ্বরাবতারত্বে পরিণতি অনুমিত হয়। এতএব স্পষ্ট বুঝা যায়, অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষসকলের আবির্ভাব দর্শনেই ভারত ক্রমে ঈশ্বরাবতারত্বে বিশ্বাসবান্ হইয়াছিল, এবং ঐরূপ মহাপুরুষসকলের অতীন্দ্রিয় দর্শন ও অনুভবাদির উপরেই ভারতীয় ধর্ম্মের সুদৃঢ় সৌধ ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া তুষারমণ্ডিত হিমাচলের ন্যায় গগন স্পর্শ করিয়াছিল। ঐরূপ পুরুষসকলকে ভারত মনুষ্যজীবনের সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্যলাভে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া 'আপ্ত' সংজ্ঞায় নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁহাদিগের বাণীসমূহে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া 'বেদ' শব্দে অভিহিত করিয়াছিল।

বিশিষ্ট ঋষিগণের ঈশ্বরাবতারত্বে পরিণতির অন্য প্রধান কারণ —ভারতের গুরূপাসনা। বেদোপনিষদের যুগ হইতেই ভারত-ভারতী বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞানদাতা আচার্য্য গুরুর উপাসনা করিতেছিল। ঐ পূজোপাসনাই তাহাদিগকে কালে দেখাইয়া দেয় যে, মানবের ভিতর অতীন্দ্রিয় ঐশী শক্তির আবির্ভাব না হইলে সে কখনও গুরুপদবী গ্রহণে সমর্থ হয় না। সাধারণ মানবজীবনের স্বার্থপরতা এবং যথার্থ গুরুগণের অহেতুক করুণায় লোকহিতাচরণ তুলনায় আলোচনা করিয়া তাহারা তাঁহাদিগকে প্রথমে এক বিভিন্ন উচ্চশ্রেণীর মানবজ্ঞানে পূজা করিতে থাকে। পরে আস্তিক্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহাদিগের মনে ঘনীভূত হইয়া যথার্থ

অবতার-বিশ্বাসের অন্য কারণ—গুরূপাসনা।

গুরুগণের অলৌকিক শক্তিপ্রকাশ তাহারা যত প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাঁহাদিগের দেবত্বে তাহারা ততই দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, ভবরোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাহারা এতকাল ধরিয়া শ্রীভগবানের করুণাপূর্ণ দক্ষিণামূর্ত্তির নিকট যে সহায়তা প্রার্থনা করিতেছিল—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"—গুরুগণের ভিতর দিয়া তাহাই এখন তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, শ্রীভগবানের করুণাই মূর্ত্তিমতী গুরুশক্তিরূপে তাহাদিগের সমক্ষে প্রকাশিত রহিয়াছে।

আবার গুরূপাসনায় মানবমন যখন এতদূর অগ্রসর হইল, তখন যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া ঐ শক্তির বিশেষ লীলা প্রকটিত হইতে লাগিল, তাঁহাদিগকে শ্রীভগবানের জ্ঞানপ্রদা দক্ষিণামূর্ত্তির সহিত অভিন্নভাবে দেখিতে তাহার বিলম্ব হইল না। ঐরূপে আচার্য্যোপাসনা কালে ভারতে অবতারবাদের আনয়নে ও পরিপুষ্টিতে সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব অবতারবাদের স্পষ্ট অভিব্যক্তি পৌরাণিক যুগে উপস্থিত হইলেও, উহার মূল যে বৈদিক যুগ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে, ইহা আর বলিতে হইবে না। বেদ, উপনিষদ্ এবং দর্শনের যুগে মানব ঈশ্বরের গুণ, কর্ম্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল পৌরাণিক যুগে সেই সকলই স্পষ্ট আকার ধারণ করিয়া অবতারবিশ্বাসরূপে অভিব্যক্ত হইল। অথবা, সংযমতপস্যাদি-সহায়ে ঔপনিষদিক যুগে মানব

বেদ এবং সমাধি-প্রসূত দর্শনের উপর অবতারবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

অবতরণিকা।

'নেতি নেতি' মার্গে অগ্রসর হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় সাফল্য-লাভপূর্ব্বক সমাধিরাজ্য হইতে বিলোমমার্গাবলম্বনে অবতরণ করিয়া সমগ্র জগৎকে ব্রহ্মপ্রকাশ বলিয়া যখন দেখিতে সমর্থ হইল, তখনই সগুণ বিরাট ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রতি তাহার প্রেমভক্তি উপস্থিত হইয়া, সে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল—এবং তখনই সে তাঁহার গুণ কর্ম্ম স্বভাবাদি সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার বিশেষভাবে অবতীর্ণ হওয়ায় বিশ্বাসবান্ হইল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পৌরাণিক যুগেই ভারতে অবতারবিশ্বাস বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। ঐ যুগের আধ্যাত্মিক বিকাশে নানা দোষ উপলব্ধ হইলেও, একমাত্র অবতার-মহিমা প্রকাশে উহার বিশেষত্ব এবং মহত্ত্ব স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। কারণ অবতার-বিশ্বাস আশ্রয় করিয়াই মানব সগুণব্রহ্মের নিত্যলীলাবিলাস বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে। উহা হইতেই সে বুঝিয়াছে যে, জগৎকারণ ঈশ্বরই আধ্যাত্মিক জগতে তাহার একমাত্র পথপ্রদর্শক; এবং উহা হইতেই তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, সে যতকাল পর্য্যন্ত যতই দুর্নীতিপরায়ণ হউক না কেন, শ্রীভগবানের অপার করুণা তাহাকে কখনই চিরদিন বিনাশের পথে অগ্রসর হইতে দিবে না—কিন্তু বিগ্রহবতী হইয়া উহা যুগে যুগে আবির্ভূত হইবে এবং তাহার প্রকৃতির উপযোগী নব নব আধ্যাত্মিক পথসমূহ আবিষ্কারপূর্ব্বক তাহার পক্ষে ধর্ম্মলাভ সুগম করিয়া দিবে।

ঈশ্বরের করুণার উপলব্ধি হইতেই পৌরাণিক যুগে অবতারবাদ প্রচার।

অমিতগুণসম্পন্ন অবতারপুরুষসকলের দিব্য জন্মকর্ম্মাদি সম্বন্ধে স্মৃতি ও পুরাণসকলে যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহার সারসংক্ষেপ এখানে উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে না। তাঁহারা বলেন, অবতারপুরুষ ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাববান্। জীবের ন্যায় কর্ম্মবন্ধনে তিনি কখনও আবদ্ধ হয়েন না। কারণ, জন্মাবধি আত্মারাম হওয়ায় পার্থিব ভোগসুখ লাভের জন্য জীবের ন্যায় স্বার্থচেষ্টা তাঁহার ভিতর কখনও উপস্থিত হয় না। শরীর ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমগ্র চেষ্টা অপরের কল্যাণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়। আবার, মায়ার অজ্ঞানবন্ধনে কখনও আবদ্ধ না হওয়ায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে শরীর পরিগ্রহ করিয়া তিনি যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন সেই সকলের স্মৃতি তাঁহাতে লুপ্ত হয় না।

অবতার-পুরুষের দিব্য-স্বভাব সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তির সারসংক্ষেপ।

প্রশ্ন হইতে পারে, ঐরূপ অখণ্ড স্মৃতি কি তবে তাঁহাতে আশৈশব বিদ্যমান থাকে? উত্তরে পুরাণকার বলেন, অন্তরে বিদ্যমান থাকিলেও শৈশবে তাঁহাতে উহার প্রকাশ থাকে না; কিন্তু শরীর-মনোরূপ যন্ত্রদ্বয় সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন হইবামাত্র স্বল্প বা বিনায়াসে উহা তাঁহাতে উদিত হইয়া থাকে; তাঁহার প্রত্যেক চেষ্টা সম্বন্ধেই ঐ কথা বুঝিতে হইবে; কারণ, মনুষ্যশরীর ধারণ করায় তাঁহার সকল চেষ্টা সর্ব্বথা মনুষ্যের ন্যায় হয়।

অবতার-পুরুষের অখণ্ড স্মৃতিশক্তি।

ঐরূপে শরীর-মন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবামাত্র অবতারপুরুষ তাঁহার বর্ত্তমান জীবনের উদ্দেশ্য সম্যক্ অবগত হন। তিনি বুঝিতে পারেন

যে, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই তাঁহার আগমন হইয়াছে। আবার ঐ উদ্দেশ্য সফল করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, তাহা কোথা হইতে অচিন্ত্য উপায়ে তাঁহাদিগের নিকট স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। মানবসাধারণের নিকট যে পথ সর্ব্বথা অন্ধকারময় বলিয়া উপলব্ধ হয়, তিনি, সেই মার্গে উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইয়া অকুতোভয়ে অগ্রসর হন এবং উদ্দেশ্যলাভে কৃতার্থ হইয়া জনসাধারণকে সেই পথে প্রবর্ত্তিত করেন। ঐরূপে মায়াতীত ব্রহ্মস্বরূপের এবং জগৎকারণ ঈশ্বরের উপলব্ধি করিবার অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন পথসমূহ তাঁহার দ্বারা যুগে যুগে পুনঃ পুনঃ আবিষ্কৃত হয়।

অবতার-পুরুষের নবধর্ম্ম স্থাপন।

অবতারপুরুষের গুণ কর্ম্ম স্বভাবাদির ঐরূপে নির্ণয় করিয়াই পুরাণকারেরা ক্ষান্ত হয়ে নাই, কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত স্পষ্ট নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সনাতন সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম যখন কালপ্রভাবে গ্লানিযুক্ত হয়, যখন মায়াপ্রসূত অজ্ঞানের অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া মানব ইহকাল এবং পার্থিব ভোগসুখ-লাভকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞানপূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে, এবং আত্মা, ঈশ্বর, মুক্তি প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় নিত্য পদার্থসকলকে কোন এক ভ্রমান্ধ যুগের স্বপ্নরাজ্যের কবিকল্পনা বলিয়া ধারণা করিয়া বসে—যখন ছলে বলে কৌশলে পার্থিব সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ ও ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করিয়াও সে প্রাণের অভাব দূর করিতে না পারিয়া অশান্তির অন্ধতমসাবৃত অকূল প্রবাহে নিপতিত হয় এবং যন্ত্রণায় হাহাকার করিতে থাকে—তখনই শ্রীভগবান্ স্বকীয় মহিমায়

অবতারপুরুষের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি।

সনাতন ধর্ম্মকে রাহুগ্রাসমুক্ত শশধরের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া তুলেন এবং দুর্ব্বল মানবের প্রতি কৃপায় বিগ্রহবান্ হইয়া তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাহাকে পুনরায় ধর্ম্মপথে প্রতিষ্ঠিত করেন। কারণ না থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি কখন সম্ভবপর নহে—তদ্রূপ সার্ব্বজনীন অভাব দূরীকরণরূপ প্রয়োজন না থাকিলে ঈশ্বরও কখনও লীলাচ্ছলে শরীর পরিগ্রহ করেন না। কিন্তু ঐরূপ কোন অভাব যখন সমাজের প্রতি-অঙ্গকে অভিভূত করে, শ্রীভগবানের অসীম করুণাও তখন ঘনীভূত হইয়া তাঁহাকে জগদ্গুরুরূপে আবির্ভূত হইতে প্রবুক্ত করে। ঐরূপ প্রয়োজন দূর করিতে ঐরূপ লীলাবিগ্রহের বারংবার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াই যে পুরাণকারেরা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, একথা বলা বাহুল্য।

অতএব দেখা যাইতেছে, নবীন ধর্ম্মের আবিষ্কর্ত্তা, জগদ্গুরু, সর্ব্বজ্ঞ অবতারপুরুষ, যুগ-প্রয়োজন সাধনের জন্যই আবির্ভূত হন।

বর্ত্তমানকালে অবতার-পুরুষের পুনরাগমন।

ধর্ম্মক্ষেত্র ভারত নানাযুগে বহুবার তাঁহার পদাঙ্ক হৃদয়ে ধারণ করিয়া পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। যুগ-প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, অমিতগুণসম্পন্ন অবতার-পুরুষের শুভাবির্ভাব এখনও তাহাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিঞ্চিদূর্দ্ধ চারিশত বৎসরমাত্র পূর্ব্বে তাহার ঐরূপে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীয় অদৃষ্টপূর্ব্ব মহিমায় শ্রীহরির নাম-সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত হইবার কথা লোকপ্রসিদ্ধ। আবার কি সেই কাল উপস্থিত হইয়াছে? আবার কি বিদেশীর ঘৃণাস্পদ, নষ্ট-গৌরব, দরিদ্র ভারতে যুগপ্রয়োজন উপস্থিত হইয়া শ্রীভগবানের

অবতরণিকা।

করুণায় বিষম উত্তেজনা আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে বর্ত্তমানকালে শরীর পরিগ্রহ করাইয়াছে? হে পাঠক, অশেষকল্যাণগুণসম্পন্ন যে মহাপুরুষের কথা আমরা তোমাকে বলিতে বসিয়াছি, তাঁহার জীবনালেচনায় বুঝিতে পারা যাইবে, ঘটনা ঐরূপ হইয়াছে— শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণাদিরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যিনি আবির্ভূত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের যুগপ্রয়োজন সাধিত করিতে তাঁহার শুভাগমন প্রত্যক্ষ করিয়া ভারত পুনরায় ধন্য হইয়াছে!

প্রথম অধ্যায়।

যুগ-প্রয়োজন।

বিদ্যা, সম্পদ্ পুরুষকার-সহায়ে মানবজীবন বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কতদুর প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা অতি স্থূলদর্শী ব্যক্তিরও সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। মানব যেন কোন ক্ষেত্রেই একটা গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হইয়া এখন আর থাকিতে চাহিতেছে না। স্থলে জলে যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করিয়া সুখী না হইয়া সে এখন অভিনব যন্ত্রাবিষ্কারপূর্ব্বক গগনচারী হইয়াছে; তমসাবৃত সমুদ্রতলে ও জ্বালাময় আগ্নেয়গিরিগর্ভে অবতীর্ণ হইয়া সে নিজ কৌতূহল-নিবৃত্তি করিয়াছে; চিরহিমানীমণ্ডিত পর্ব্বত ও সাগরপারে গমন-পূর্ব্বক সে ঐ সকল প্রদেশের যথাযথ রহস্য অবলোকনে সমর্থ হইয়াছে; পৃথিবীস্থ ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় লতা, ওষধি ও পাদপের ভিতর সে আপনার ন্যায় প্রাণস্পন্দনের পরিচয় পাইয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার প্রাণিজাতকে নিজ প্রত্যক্ষ ও বিচারচক্ষুর অন্তর্ভুক্ত করিয়া জ্ঞানসিদ্ধিরূপ স্বকীয় উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছে। ঐরূপে ক্ষিত্যপ্‌তেজাদি ভূত-পঞ্চের উপর আধিপত্য স্থাপনপূর্ব্বক সে এখন জড়া পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কথা জানিয়া লইয়াছে এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া সুদূরাবস্থিত গ্রহনক্ষত্রাদির সম্যক্ সংবাদ লইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ক্রমে উহাতেও কৃতকার্য্য হইতেছে। অন্তর্জগৎ

মানব বর্ত্তমান-কালে কতদূর উন্নত ও শক্তি-শালী হইয়াছে।

পরিদর্শনেও তাহার উদ্যমের অভাব লক্ষিত হইতেছে না। ভূয়োদর্শন এবং গবেষণা-সহায়ে ঐ ক্ষেত্রেও মানব নূতন তত্ত্বসকল এখন নিত্য আবিষ্কার করিতেছে। জীবনরহস্য অনুশীলন করিতে যাইয়া সে একজাতীয় প্রাণীর অন্য জাতিত্বে পরিণতির বা ক্রমাভিব্যক্তির কথা জানিতে পারিয়াছে; শরীর ও মনের স্বভাব আলোচনাপূর্ব্বক আদ্যন্তবান্ সূক্ষ্ম জড়োপাদানে মনের গঠনরূপ তত্ত্ব নির্ণয়ে সক্ষম হইয়াছে; জড়জগতের ন্যায় অন্তর্জগতের প্রত্যেক ঘটনা অলঙ্ঘ্য নিয়মসূত্রে গ্রথিত বলিয়া জানিতে পারিযাছে, এবং আত্মহত্যাদি অসম্বদ্ধ মানসিক ব্যাপারসকলের মধ্যেও সূক্ষ্ম নিয়মশৃঙ্খলের পরিচয পাইযাছে। আবার, ব্যক্তিগত জীবনের চিরাস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চয় প্রমাণ লাভে সমর্থ না হইলেও ইতিহাসালোচনায় মানব তাহার জাতিগত জীবনের ক্রমোন্নতি প্রত্যক্ষ করিযাছে। ব্যক্তিগত জীবনের সার্থকতা ঐরূপে জাতিগত জীবনে দেখিতে পাইয়া সে এখন উহার সাফল্যের জন্য, বিজ্ঞান ও সংহতচেষ্টা সহায়ে অজ্ঞানের সহিত চিরসংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছে, এবং অনন্ত সংগ্রামে অনন্ত উন্নতি কল্পনাপূর্ব্বক বহিরন্তর্রাজ্যের দুর্লক্ষ্য প্রদেশসমূহে পৌঁছিবার জন্য অনন্ত বাসনাপ্রবাহে আপন জীবনতরী ভাসাইয়া দিয়াছে।

পাশ্চাত্য মানবকে অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত জীবন-প্রসার বিশেষভাবে উদিত হইলেও ভারতপ্রমুখ্য প্রাচ্য দেশসকলেও উহার প্রভাব স্বল্প লক্ষিত হইতেছে না। বিজ্ঞানের অদম্য শক্তিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রদেশ প্রতিদিন যত নিকট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতেছে, প্রাচ্য মানবের প্রাচীন জীবনসংস্কারসমূহ ততই পরিবর্ত্তিত হইয়া

পাশ্চাত্য মানবের ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছে। পারস্য, চীন, জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশসমূহের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনায় ঐ কথা বুঝিতে পারা যায়। ফলাফল ভবিষ্যেতে যেরূপ হউক না কেন, প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্যের ঐরূপ ভাববিস্তার সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকে না, এবং সমগ্র পৃথিবীর, কালে, পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

ঐ উন্নতি ও শক্তির কেন্দ্র পাশ্চাত্য হইতে প্রাচ্যে ভাববিস্তার।

পূর্ব্বোক্ত প্রসারতার ফলাফল নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে পাশ্চাত্যকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিতে হইবে। বিচারসহায়ে পাশ্চাত্য মানবের জীবন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে—ঐ প্রসারের মূল কোথায় এবং উহা কীদৃশ স্বভাববিশিষ্ট, উহার প্রভাবে পাশ্চাত্য জীবনের পূর্ব্বতম উত্তমাধম ভাবসকলের কতদূর উন্নতি এবং বিলোপ সাধিত হইয়াছে, এবং উহার ফলে পাশ্চাত্যে ব্যক্তিগত মানবমনে সুখ ও দুঃখ পূর্ব্বাপেক্ষা কত অধিক বা অল্প পরিমাণে উপস্থিত হইয়াছে। ঐরূপে ব্যষ্টি ও সমষ্টীভূত পাশ্চাত্য-জীবনে উহার ফলাফল একবার নির্ণীত হইলে, দেশকালভেদে ঐ বিষয়ের অন্যত্র নির্ণয় করা কঠিন হইবে না।

পাশ্চাত্য মানবের জীবন দেখিয়া ঐ উন্নতির ভবিষ্যৎ ফলাফল নির্ণয় করিতে হইবে।

ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে, দুঃসহ শীতের প্রকোপ অতি প্রাচীন কাল হইতে পাশ্চাত্য মানবমনে দেহবুদ্ধির দৃঢ়তা আনয়ন করিয়া, তাহাকে একদিকে যেমন স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি আবার সংহত-চেষ্টায় স্বার্থসিদ্ধি—

একথা সহজে বুঝাইয়া উহাতে স্বজাতিপ্রীতির আবির্ভাব করিয়াছিল।

পাশ্চাত্য মানবের উন্নতির কারণ ও ইতিহাস।

ঐ স্বার্থপরতা এবং স্বজাতিপ্রীতিই তাহাকে, কালে অদম্য উৎসাহে অপরজাতিসকলকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের ধনসম্পদে নিজ জীবন ভূষিত করিতে প্ররোচিত করে। উহার ফলে যখন সে নিজ জীবন যাত্রার কতকটা সুসার করিতে পারিল, তখনই তাহাতে ধীরে ধীরে অন্তর্দৃষ্টির আবির্ভাব হইয়া তাহাকে ক্রমে বিদ্যা ও সদ্‌গুণসম্পন্ন হইতে প্রবৃত্ত করিল। ঐরূপে জীবনসংগ্রাম ভিন্ন উচ্চ বিষয়সকলে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবামাত্র সে দেখিতে পাইল —ঐ লক্ষ্যে অগ্রসর হইবার পথে ধর্ম্মবিশ্বাস এবং পুরোহিতকুলের প্রাধান্য তাহার অন্তরায়স্বরূপে দণ্ডায়মান। দেখিল, বিদ্যাশিক্ষায় শ্রীভগবানের অপ্রসন্নতালাভে অনন্তনিরয়গামী হইতে হইবে, কেবলমাত্র ইহা বলিয়াই পুরোহিতকুল নিশ্চিত নহেন, কিন্তু ছলে বলে কৌশলে তাহাকে ঐ পথে অগ্রসর হইতে বাধা প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর। তখন স্বার্থসাধন-তৎপর পাশ্চাত্য মানবের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে বিলম্ব হইল না। সবল হস্তে পুরোহিতকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সে আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। ঐরূপে ধর্ম্মযাজকের সহিত শাস্ত্র ও ধর্ম্মবিশ্বাসকে দূর পরিহার করিয়া, পাশ্চাত্য নবীন পথে নিজ জীবন পরিচালিত করে; এবং পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতারূপ নিশ্চিত প্রমাণ প্রয়োগ না করিয়া কোন বিষয় কখনও বিশ্বাস বা গ্রহণ করিবে না, ইহাই তাহার নিকট মূলমন্ত্র হইয়া উঠে।

ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বিচারানুমানাদিপূর্ব্বক বিষয়-বিশেষের সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে হইবে, ইহা নিশ্চয়

করিয়া পাশ্চাত্য এখন হইতে যুষ্মদপ্রত্যয়গোচর বিষয়ের উপাসক হইয়া পড়ে এবং অস্মদ্‌প্রত্যয়গোচর বিষয়ীকে বিষয়সকলের মধ্যে অন্যতম ভাবিয়া, উহার স্বভাবাদিও পূর্ব্বোক্ত প্রমাণপ্রয়োগে জানিতে অগ্রসর হয়। গত চারি শত বৎসর সে ঐরূপে জাগতিক প্রত্যেক ব্যক্তি ও বিষয়কে পঞ্চেন্দ্রিয়সহায়ে পরীক্ষাপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ঐকালের ভিতরেই বর্ত্তমান যুগের জড়বিজ্ঞান শৈশবের জড়তা এবং অসহায়তা হইতে মুক্ত হইয়া যৌবনের উদ্যম, আশা, আনন্দ ও বলোন্মত্ততায় উপস্থিত হইয়াছে।

আত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মানবের মূর্খতা উহার কারণ; এবং ঐজন্য তাহার মনের অশান্তি।

কিন্তু জড়বিজ্ঞানের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারিলেও, পূর্ব্বোক্ত নীতি আত্মবিজ্ঞানসম্বন্ধে পাশ্চাত্যকে পথ দেখাইতে পারে নাই। কারণ, সংযম, স্বার্থহীনতা এবং অন্তর্ম্মুখতাই ঐ বিজ্ঞানলাভের একমাত্র পথ এবং নিরুদ্ধবৃত্তি মনই আত্মোপলব্ধির একমাত্র যন্ত্র। অতএব বহির্ম্মুখ পাশ্চাত্যের ঐ বিষয়ে পথ হারাইয়া দিন দিন দেহাত্মবাদী নাস্তিক হইয়া উঠায় কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নাই। সেজন্য ঐহিকের ভোগ-সুখই পাশ্চাত্যের নিকট এখন সর্ব্বস্বরূপে পরিগণিত, এবং তল্লাভেই সে সবিশেষ যত্নশীল; এবং তাহার বিজ্ঞানলব্ধ পদার্থজ্ঞান ঐ বিষয়েই প্রধানতঃ প্রযুক্ত হইয়া তাহাকে দিন দিন দাম্ভিক ও স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে। ঐজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, পাশ্চাত্যে সুবর্ণগত জাতিবিভাগ, প্রলয়বিষাণনাদী করাল কামান বন্দুকাদি, অসামান্য শ্রীর পার্শ্বে দারিদ্র্যজাত অসীম অসন্তোষ এবং

ভীষণ ধনপিপাসা, পরদেশাধিকার ও পরজাতি-প্রপীড়নাদি। ঐজন্যই আবার দেখিতে পাওয়া যায়, ভোগসুখের চরমে উপস্থিত হইয়াও পাশ্চাত্য নরনারীর আত্মার অভাব ঘুচিতেছে না এবং মৃত্যুর পারে জাতিগত অস্তিত্বে বিশ্বাসমাত্র অবলম্বনে তাহারা কিছুতেই সুখী হইতে পারিতেছে না। বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে পাশ্চাত্য এখন বুঝিয়াছে যে, পঞ্চেন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান তাহাকে দেশকালাতীত বস্তুতত্ত্বাবিষ্কারে কখন সমর্থ করিবে না। বিজ্ঞান তাহাকে ঐ বস্তুর ক্ষণিক আভাসমাত্র প্রদানপূর্ব্বক উহাকে ধরা বুঝা তাহার সাধ্যাতীত বলিয়া নিবৃত্ত হয়। অতএব যে দেবতার বলে সে আপনাকে এতকাল বলীয়ান্ ভাবিয়াছিল, যাহার প্রসাদে তাহার যাবতীয় ভোগশ্রী ও সম্পদ্, সেই দেবতার পরাভবে পাশ্চাত্য মানবের আন্তরিক হাহাকার এখন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে এবং আপনাকে সে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিতেছে।

পাশ্চাত্যের ন্যায় উন্নতি লাভ করিতে হইলে স্বার্থপর ও ভোগলোলুপ হইতে হইবে।

পাশ্চাত্য জীবনের পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসালোচনায় আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, উহার প্রসারভিত্তির মূলে বিষয়প্রবণতা, স্বার্থপরতা এবং ধর্ম্মবিশ্বাসরাহিত্য বিদ্যমান। অতএব ব্যক্তি বা জাতিগত জীবনে পাশ্চাত্যের অনুরূপ ফললাভ করিতে হইলে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অপরকে ঐ ভিত্তির উপরেই নিজ জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সেজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, জাপানী প্রভৃতি যে সকল প্রাচ্য জাতি পাশ্চাত্যের ভাবে জাতীয় জীবন গঠনে তৎপর হইয়াছে, স্বদেশ এবং স্বজাতিপ্রীতির সহিত তাহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দোষসকলেরও আবির্ভাব হইতেছে।

পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত হওয়ায় উহাই বিষম দোষ। পাশ্চাত্য-সংসর্গে ভারতের জাতীয় জীবনে যে অবস্থার উদয় হইয়াছে, তাহার অনুশীলনে ঐকথা আমরা আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিব।

ভারতের প্রাচীন জাতীয় জীবনের ভিত্তি।

এখানে প্রথমেই প্রশ্ন উঠিবে—পাশ্চাত্য সংসর্গে আসিবার পূর্ব্বে 'জাতীয় জীবন' বলিয়া একটা কথা ভারতে বিদ্যমান ছিল কি না। উত্তরে বলিতে হইবে, কথা না থাকিলেও ঐ কথার লক্ষ্য যাহা, তাহা যে একভাবে ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, তখনও সমগ্র ভারত শ্রীগুরু, গঙ্গা, গায়ত্রী এবং গীতায় শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিল, তখনও গোকুলের পূজা উহার সর্ব্বত্র লক্ষিত হইত, তখনও ভারতের আবালবৃদ্ধ নরনারী রামায়ণ ও মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থসকল হইতে একই ভাবতরঙ্গ হৃদয়ে বহন করিয়া জীবন পরিচালিত করিত এবং উহার বিভিন্ন বিভাগের বুধমণ্ডলী আপন আপন মনোভাব দেব-ভাষায় পরস্পরের নিকটে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইতেন। ঐরূপ আরও অনেক একতাসূত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মানুষ্ঠান যে ঐ একতার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ছিল, একথা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায়।

ভারতের জাতীয় জীবন ঐরূপে ধর্ম্মাবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া উহার সভ্যতা এক অপূর্ব্ব বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। এক কথায় বলিতে হইলে, সংযমই ঐ সভ্যতার প্রাণ-স্বরূপ ছিল। ব্যক্তি এবং জাতি উভয়কেই ভারত সংযমসহায়ে নিজ নিজ জীবন নিয়মিত করিতে শিক্ষা প্রদান করিত। ত্যাগের জন্য ভোগের গ্রহণ এবং পরজীবনের জন্য এই জীবনের শিক্ষা—একথা সকলকে

সর্ব্বাবস্থায় স্মরণ করাইয়া ব্যক্তি ও জাতির ব্যবহারিক জীবন সে সর্ব্বদা উচ্চতম লক্ষ্যে পরিচালিত করিত। সেজন্যই উহার বর্ণ বা জাতিবিভাগ এতকাল পর্য্যন্ত কোন শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত করিয়া তাহাদিগের বিষম অসন্তোষের কারণ হয় নাই। কারণ, সমাজের যে শ্রেণী বা স্তরে মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই স্তরের কর্ত্তব্য নিষ্কামভাবে করিতে পারিলেই সে যখন অন্যের সহিত সমভাবে মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞান ও মুক্তির অধিকারী হইবে, তখন তাহার অসন্তোষের কারণ আর কি হইতে পারে? শ্রেণীবিশেষের ভোগ-সুখের তারতম্যকে অধিকার করিয়া পাশ্চাত্যসমাজের ন্যায় ভারতের সমাজে যে প্রাচীনকালে বিরোধ উপস্থিত হয় নাই, তাহার কারণ—জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সমানাধিকার ছিল বলিয়া। প্রাচীন ভারতের জাতীয় জীবন সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথা-গুলি স্মরণে রাখিয়া দেখা যাউক, পাশ্চাত্য-সংসর্গে উহার জীবনে কীদৃশ পরিবর্ত্তন সকল এখন উপস্থিত হইয়াছে।

উহা ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া ভোগ-সাধন লইয়া ভারতের সমাজে কখন বিবাদ উপস্থিত হয় নাই।

পাশ্চাত্যের ভারতাধিকারের দিন হইতে ভারতের জাতীয় ধন-বিভাগ প্রণালীতে যে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে, ইহা স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভারতের জাতীয় জীবনের ঐ ভাগ মাত্র পরিবর্ত্তিত করিয়াই পাশ্চাত্য-প্রভাব নিবৃত্ত হয় নাই। প্রাচীনকাল হইতে যে সকল মূল সংস্কার লইয়া ভারত-ভারতী ব্যক্তি ও জাতিগত জীবন পরিচালিত করিতেছিল, সেই সকলের মধ্যে

পাশ্চাত্যের ভারতাধিকার ও তাহার ফল।

ঐ প্রভাব এক অপূর্ব্ব ভাব-পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিল। পাশ্চাত্য বুঝাইল, ত্যাগের জন্য ভোগ, এ কথা পুরোহিতকুলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উদ্ভূত হইয়াছে; পরজীবনের ও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার এক প্রকাণ্ড কবিকল্পনা; সমাজের যে স্তরে মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই স্তরেই সে আমরণ নিবদ্ধ থাকিবে, ইহা অপেক্ষা অযুক্তিকর, অন্যায় নিয়ম আর কি হইতে পারে? ভারতও ক্রমে তাহাই বুঝিল এবং ত্যাগ ও সংযম-প্রধান পূর্ব্ব জীবন-লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর ভোগ লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ঐরূপে উহাতে পূর্ব্ব শিক্ষাদীক্ষার লোপ হইল এবং নাস্তিক্য, পরানুকরণ-প্রিয়তা ও আত্মবিশ্বাসরাহিত্যের উদয় হইয়া উহাকে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর তুল্য নিতান্ত নির্বীর্য্য করিয়া তুলিল। ভারত বুঝিল, সে এতকাল ধরিয়া যাহা হৃদয়ে বহন করিয়া যত্নে অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল,—বিজ্ঞানবলে বলীয়ান্ পাশ্চাত্য তাহার সংস্কারসমূহকে অমার্জ্জিত ও অর্দ্ধ বর্ব্বর বলিয়া যেরূপ নির্দ্দিষ্ট করিতেছে, তাহাই বোধ হয় সত্য। ভোগলালসামুগ্ধ ভারত নিজ পূর্ব্বেতিহাস ও পূর্ব্বগৌরব বিস্মৃত হইল। স্মৃতিভ্রংশ হইতে তাহার বুদ্ধিনাশ উপস্থিত হইল এবং উহা তাহার জাতীয় অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করিবার উপক্রম করিল। আবার ঐহিক ভোগ লাভের জন্য তাহাকে এখন হইতে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হওয়ায় উহার লাভও তাহার ভাগ্যে দূরপরাহত হইল। ঐরূপে যোগ ও ভোগ উভয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কর্ণধারশূন্য তরণীর ন্যায় সে পরানুকরণ করিয়া বাসনাবাত্যাভিমুখে যথাইচ্ছা পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

তখন চারি দিক্ হইতে রব উঠিল, ভারতের জাতীয় জীবন কোন কালেই ছিল না। পাশ্চাত্যের কৃপায় এতদিনে তাহার ঐ জীবনের উন্মেষ হইতেছে, কিন্তু উহার পূর্ণাবির্ভাবের পথে এখনও অনেক অন্তরায় বিদ্যমান। ঐ যে উহার দুর্নিবার্য্য ধর্ম্মসংস্কার, উহাই উহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ঐ যে অসংখ্য দেবদেবীর পূজা—ঐ পৌত্তলিকতাই তাহাকে এতদিন উঠিতে দেয় নাই। উহার বিনাশ কর, উচ্ছেদ কর, তবেই ভারত-ভারতী সজীব হইয়া উঠিবে। ঈশাহি ধর্ম্ম এবং তদনুকরণে একেশ্বরবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্যানুকরণে সভাসমিতি গঠিত হইয়া প্রাণহীন ভারতকে রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, বিধবাবিবাহ ও স্ত্রী-স্বাধীনতার উপকারিতা প্রভৃতি নানা কথা শ্রবণ করান হইল—কিন্তু তাহার অভাববোধ ও হাহাকার নিবৃত্ত না হইয়া প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পাশ্চাত্য সভ্যতার যত কিছু সাজ সরঞ্জাম একে একে ভারতে উপস্থিত করা হইল—কিন্তু বৃথা চেষ্টা—যে ভাবপ্রেরণায় ভারত সজীব ছিল তাহার অনুসন্ধান এবং পুনঃপ্রবর্ত্তনের চেষ্টা ঐ সকলে কিছুমাত্র হইল না। ঔষধ যথাস্থানে প্রযুক্ত হইল না, রোগের উপশম হইবে কিরূপে? ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের ধর্ম্ম সজীব না হইলে সে সজীব হইবে কিরূপে? পাশ্চাত্যের ভাবপ্রসারে তাহাতে যে ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, নাস্তিক পাশ্চাত্যের তাহা দূর করিবার সামর্থ্য কোথায়? স্বয়ং অসিদ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য অপরকে সিদ্ধ করিবে কিরূপে?

পাশ্চাত্য ভাব-সহায়ে নির্জীব ভারতকে সজীব করিবার চেষ্টা ও তাহার ফল।

পাশ্চাত্যাধিকারের পূর্ব্বে ভারতের জাতীয় জীবনে যে কিছুমাত্র

দোষ ছিল না, এ কথা বলা যায় না। কিন্তু জাতীয় শরীর সজীব থাকায় ঐ দোষ নিবারণের স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টাও উহাতে সর্ব্বদা লক্ষিত হইত। জাতি এবং সমাজের ভিতর এখন সেই চেষ্টার বিলোপ দেখিয়া বুঝিতে হইবে, পাশ্চাত্যভাব-প্রসাররূপ ঔষধ-প্রয়োগ রোগের সহিত রোগীকেও সরাইতে বসিয়াছে।

ভারতের প্রাচীন জাতীয় জীবনের দোষ গুণ বিচার।

অতএব দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্যের ধর্ম্মগ্লানি ভারতেও অধিকার বিস্তার করিয়াছে। বাস্তবিক ঐ গ্লানি বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কতদূর প্রবল হইয়াছে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ধর্ম্ম বলিয়া যদি কোন বাস্তব পদার্থ থাকে এবং বিধাতার নির্দ্দেশে তল্লাভ যদি মানবের সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগের ভোগপরায়ণ মানবজীবন যে উহা হইতে বহুদূরে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, একথা নিঃসন্দেহ। বিজ্ঞান সহায়ে মানবের বর্ত্তমান জীবন-প্রসার মানবকে বিচিত্র ভোগসাধন-লাভে সমর্থ করিলেও, তাহাকে যে শান্তির অধিকারী করিতে পারিতেছে না, তাহা ঐজন্য। কে উহার প্রতিকার করিবে? পৃথিবীর ঐ অশান্তি ও হাহাকার কাহার প্রাণে নিরন্তর ধ্বনিত হইয়া তাহাকে সর্ব্বভোগসাধন উপেক্ষাপূর্ব্বক যুগোপযোগী নূতন ধর্ম্মপথাবিষ্কারে প্রযুক্ত করিবে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্ম্ম-গ্লানি দূর করিয়া শান্তিময় নূতন পথে জীবন পরিচালিত করিতে মানবকে পুনরায় কে শিক্ষা প্রদান করিবে?

পাশ্চাত্যভাব বিস্তারে ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্মগ্লানি।

যুগ-প্রয়োজন।

গীতামুখে শ্রীভগবান্ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, জগতে ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হইলেই তিনি নিজ মায়াশক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক শরীরধারী-রূপে প্রকাশিত হইবেন এবং ঐ গ্লানি দূর করিয়া পুনরায় মানবকে শান্তির অধিকারী করিবেন। বর্ত্তমান যুগপ্রয়োজন কি তাঁহার করুণায় বিষম উত্তেজনা আনয়ন করিবে না? বর্ত্তমান অভাববোধ ও অশান্তি কি তাঁহাকে শরীর পরিগ্রহ করিতে প্রবুক্ত করিবে না?

গ্লানি নিবারণের জন্য ঈশ্বরের পুনরায় অবতীর্ণ হওয়া।

হে পাঠক! যুগপ্রয়োজন ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে—শ্রীভগবান্ জগদ্‌গুরুরূপে সত্য সত্যই পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছেন! আশ্বস্তহৃদয়ে শ্রবণ কর, তাঁহার পূত আশীর্ব্বাণী,—"যত মত, তত পথ," "সর্ব্বান্তকরণে যাহাই অনুষ্ঠান করিবে, তাহা হইতেই তুমি শ্রীভগবানকে লাভ করিবে!" মুগ্ধ হইয়া মনন কর—পরাবিদ্যা পুনরানয়নের জন্য তাঁহার অলৌকিক ত্যাগ ও তপস্যা!—এবং তাঁহার কামগন্ধহীন পুণ্যচরিত্রের যথাসাধ্য আলোচনা ও ধ্যান করিয়া, আইস, আমরা উভয়ে পবিত্র হই!

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কামারপুকুর ও পিতৃপরিচয়।

দরিদ্রগৃহে ঈশ্বরের অবতীর্ণ হইবার কারণ।

ঈশ্বরাবতার বলিয়া যে সকল মহাপুরুষ জগতে অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন, শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র ও শাক্যসিংহের কথা ছাড়িয়া দিলে, তাঁহাদিগের সকলেরই পার্থিব জীবন দুঃখ দারিদ্র্য, সংসারের অসচ্ছলতা এবং এমন কি কঠোরতার ভিতর আরম্ভ হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, ক্ষত্রিয়রাজকুল অলঙ্কৃত করিলেও শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কারাগৃহে জন্ম ও আত্মীয়স্বজন হইতে দূরে, নীচ গোপকুলমধ্যে বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল; শ্রীভগবান্ ঈশা পান্থশালায় পশুরক্ষাগৃহে দরিদ্র পিতামাতার ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; শ্রীভগবান্ শঙ্কর দরিদ্র বিধবার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নগণ্য সাধারণ ব্যক্তির গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; ইস্লাম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীমৎ মহম্মদের জীবনেও ঐ কথার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐরূপ হইলেও কিন্তু, যে দুঃখ-দারিদ্রের ভিতর সন্তোষের সরসতা নাই, যে অসচ্ছল সংসারে নিঃস্বার্থতা ও প্রেম নাই, যে দরিদ্র পিতামাতার হৃদয়ে ত্যাগ, পবিত্রতা এবং কঠোর মনুষ্যত্বের সহিত কোমল দয়াদাক্ষিণ্যাদি ভাবসমূহের মধুর সামঞ্জস্য নাই, সে স্থলে তাঁহারা কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

কামারপুকুর ও চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশের মানচিত্র।

স্কেল-প্রতি ইঞ্চি=১ মাইল

কামারপুকুর ও পিতৃপরিচয়।

ভাবিয়া দেখিলে, পূর্ব্বোক্ত বিধানের সহিত তাঁহাদিগের ভাবী জীবনের একটা গূঢ় সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। কারণ, যৌবন এবং প্রৌঢ়ে যাঁহাদিগকে সমাজের দুঃখী, দরিদ্র ও অত্যাচারিতদিগের নয়নাশ্রু মুছাইয়া হৃদয়ে শান্তিপ্রদান করিতে হইবে, তাঁহারা ঐসকল ব্যক্তির অবস্থার সহিত পূর্ব্ব হইতে পরিচিত ও সহানুভূতি-সম্পন্ন না হইলে ঐ কার্য্য সাধন করিবেন কিরূপে? শুদ্ধ তাহাই নহে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, সংসারে ধর্ম্মগ্লানি নিবারণের জন্যই অবতারপুরুষসকলের অভ্যুদয় হয়। ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে পূর্ব্বপ্রচারিত ধর্ম্মবিধানসকলের যথাযথ অবস্থার সহিত প্রথমেই পরিচিত হইতে হয় এবং ঐসকল প্রাচীন বিধানের বর্ত্তমান গ্লানির কারণ আলোচনাপূর্ব্বক তাহাদিগের পূর্ণতা ও সাফল্যস্বরূপ দেশকালোপযোগী নূতন বিধান আবিষ্কার করিতে হয়। ঐ পরিচয়লাভের বিশেষ সুযোগ দরিদ্রের কুটীর ভিন্ন ধনীর প্রাসাদ কখনও প্রদান করে না। কারণ, সংসারের সুখভোগে বঞ্চিত দরিদ্র ব্যক্তিই ঈশ্বর এবং তাঁহার বিধানকে জীবনের প্রধান অবলম্বনস্বরূপে সর্ব্বদা দৃঢ়ালিঙ্গন করিয়া থাকে। অতএব সর্ব্বত্র ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানের যথাযথ কিঞ্চিদাভাস দরিদ্রের কুটীরকে তখনও উজ্জ্বল করিয়া রাখে; এবং ঐজন্যই বোধ হয়, জগদ্গুরু মহাপুরুষসকল জন্ম পরিগ্রহকালে দরিদ্র পরিবারেই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

যে মহাপুরুষের কথা আমরা বলিতে বসিয়াছি, তাঁহার জীবনারম্ভও পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অতিক্রম করে নাই।

হুগলি জেলার উত্তরপশ্চিমাংশ যেখানে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর

জেলাদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সন্ধিস্থলের অনতিদূরে তিন খানি গ্রাম ত্রিকোণমণ্ডলে পরস্পরের সন্নিকটে অবস্থিত আছে। গ্রামবাসীদিগের নিকটে ঐ গ্রামত্রয় শ্রীপুর, কামারপুকুর ও মুকুন্দপুররূপে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত থাকিলেও, উহারা পরস্পর এত ঘন সন্নিবেশে অবস্থিত যে, পথিকের নিকটে একই গ্রামের বিভিন্ন পল্লী বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। সেজন্য চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকলে উহারা একমাত্র কামারপুকুর নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্থানীয় জমীদারদিগের বহুকাল ঐ গ্রামে বাস থাকাতেই বোধ হয় কামারপুকুরের পূর্ব্বোক্ত সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই কালে কামারপুকুর শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমান মহারাজের গুরুবংশীয়দিগের লাখরাজ জমিদারীভুক্ত ছিল এবং তাঁহাদিগের বংশধর শ্রীযুক্ত গোপীলাল, সুখলাল প্রভৃতি গোস্বামিগণ * ঐ গ্রামে বাস করিতেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মভূমি কামারপুকুর।

কামারপুকুর হইতে বর্দ্ধমানসহর প্রায় বত্রিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। উক্ত সহর হইতে আসিবার বরাবর পাকা রাস্তা আছে।

* ৺হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে সুখলালের স্থলে অনুপ গোস্বামীর নাম বলিয়াছিলেন; কিন্তু বোধ হয় উহা সমীচীন নহে। গ্রামের বর্ত্তমান জমীদার লাহাবাবুদের নিকটে শুনিয়াছি, উক্ত গোস্বামিজীর নাম সুখলাল ছিল এবং ইঁহার পুত্র কৃষ্ণলাল গোস্বামীর নিকট হইতেই তাঁহারা প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বে কামারপুকুরের অধিকাংশ জমী ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। ...বার গ্রামে প্রবাদ আছে, ৺গোপেশ্বর নামক বৃহৎ শিবলিঙ্গ গোপীলাল গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত করেন, অতএব উক্ত গোপীলাল গোস্বামী সুখলালের কোন পূর্ব্বতন পুরুষ ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। অথবা এমনও হইতে পারে,—সুখলালের অন্য নাম গোপীলাল ছিল।

কামারপুকুর ও পিতৃপরিচয়।

কামারপুকুরে আসিয়াই ঐ রাস্তার শেষ হয় নাই; ঐ গ্রামকে অৰ্দ্ধবেষ্টন করিয়া উহা দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে ৺পুরীধাম পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। পাদচারী দরিদ্র যাত্রী এবং বৈরাগ্যবান সাধুসকলের অনেকে ঐ পথ দিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে গমনাগমন করেন।

কামারপুকুরের প্রায় ৯।১০ ক্রোশ পূর্ব্বে ৺তারকেশ্বর মহাদেবের প্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত। ঐ স্থান হইতে দারুকেশ্বর নদের তীরবর্ত্তী জাহানাবাদ বা আরামবাগের মধ্য দিয়া কামারপুকুরে আসিবার একটি পথ আছে। তদ্ভিন্ন উক্ত গ্রামের প্রায় নয় ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত ঘাটাল হইতে এবং প্রায় তের ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত বন-বিষ্ণুপুর হইতেও এখানে আসিবার প্রশস্ত পথ আছে।

কামারপুকুর অঞ্চলের পূর্ব্ব-সমৃদ্ধি ও বর্ত্তমান অবস্থা।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়াপ্রসূত মহামারীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে কৃষিপ্রধান বঙ্গের পল্লীগ্রামসকলে কি অপূর্ব্ব শান্তির ছায়া অবস্থান করিত, তাহা বলিবার নহে। বিশেষতঃ হুগলি বিভাগের এই গ্রামসকলের বিস্তীর্ণ ধান্যপ্রান্তর-সকলের মধ্যগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি বিশাল হরিৎ-সাগরে ভাসমান দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় প্রতীত হইত। জমীর উর্ব্বরতায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব না থাকায় এবং নির্ম্মল বায়ুতে নিত্য পরিশ্রমের ফলে গ্রামবাসাদিগের দেহে স্বাস্থ্য ও সবলতা এবং মনে প্রীতি ও সন্তোষ সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইত। বহুজনাকীর্ণ গ্রামসকলে আবার, কৃষি ভিন্ন ছোট খাট নানাপ্রকার শিল্পব্যবসায়েও লোকে নিযুক্ত থাকিত। ঐরূপে উৎকৃষ্ট জিলাপী, মিঠাই ও নবাত প্রস্তুত করিবার জন্য কামারপুকুর এই অঞ্চলে চির-প্রসিদ্ধ এবং আবলুষ কাষ্ঠনির্ম্মিত হুঁকার নল নির্ম্মাণপূর্ব্বক ঐ

গ্রাম কলিকাতার সহিত কারবারে এখনও বেশ দু'পয়সা অর্জ্জন করিয়া থাকে। সূতা, গামছা ও কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য এবং অন্য নানা শিল্পকার্য্যেও কামারপুকুর এককালে প্রসিদ্ধ ছিল। বিষ্ণু চাপড়ি প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী এই গ্রামে বাস করিয়া তখন কলিকাতার সহিত অনেক টাকার কারবার করিতেন। প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে গ্রামে এখনও হাট বসিয়া থাকে। তারাহাট, বদনগঞ্জ, সিহর, দেশরা প্রভৃতি চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকল হইতে লোকে সূতা, বস্ত্র, গামছা, হাঁড়ি, কলস, কুলা, চেঙ্গারি, মাদুর, চেটাই প্রভৃতি সংসারের নিত্যব্যবহার্য্য পণ্য ও ক্ষেত্রজ দ্রব্যসকল হাটবারে কামারপুকুরে আনয়নপূর্ব্বক পরস্পরে ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। গ্রামে আনন্দোৎসবের অভাব এখনও লক্ষিত হয় না। চৈত্রমাসে মনসাপূজা ও শিবের গাজনে এবং বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠে চব্বিশ প্রহরীয় হরিবাসরে কামারপুকুর মুখরিত হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন জমীদারবাটীতে বারমাস সকলপ্রকার পাল পার্ব্বণ এবং প্রতিষ্ঠিত দেবালয়সকলে নিত্যপূজা ও পার্ব্বণাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অবশ্য, দারিদ্র্যজনিত অভাব বর্ত্তমানে ঐ সকলের অনেকাংশে লোপ সাধন করিয়াছে।

ঐ অঞ্চলে ৺ধর্ম্মঠাকুরের পূজা।

৺ধর্ম্মঠাকুরের পূজায়ও এখানে এককালে বিশেষ আড়ম্বর ছিল। কিন্তু এখন আর সেই কাল নাই; বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্যতম শ্রীধর্ম্ম এখন কূর্ম্মমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া এবং এখানে চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকলে সামান্য পূজা মাত্রই পাইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণকেও সময়ে সময়ে ঐ মূর্ত্তির পূজা করিতে দেখা গিয়া থাকে। উক্ত ধর্ম্মঠাকুরের ভিন্ন ভিন্ন নাম

বিভিন্ন গ্রামে শুনিতে পাওয়া যায়। যথা, কামারপুকুরের ধর্ম্মঠাকুরের নাম—'রাজাধিরাজ ধর্ম্ম'; শ্রীপুরে প্রতিষ্ঠিত উক্ত ঠাকুরের নাম—'যাত্রাসিদ্ধিরায় ধর্ম্ম', এবং মুকুন্দপুরের সন্নিকটে মধুবাটী নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের নাম 'সন্ন্যাসীরায় ধর্ম্ম'। কামারপুকুরে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের রথযাত্রাও এককালে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। নবচূড়াসমন্বিত সুদীর্ঘ রথখানি তখন তাঁহার মন্দিরপার্শ্বে নিত্য নয়নগোচর হইত। ভগ্ন হইবার পরে ঐ রথ আর নির্ম্মিত হয় নাই। ধর্ম্মমন্দিরটিও সংস্কারাভাবে ভূমিসাৎ হইতে বসিয়াছে দেখিয়া, ধর্ম্মপণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর তাঁহার নিজ বাটিতে ঠাকুরকে এখন স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতি, সদ্গোপ, কামার, কুমার, জেলে, ডোম প্রভৃতি উচ্চনীচ সকল প্রকার জাতিরই কামারপুকুরে বসতি আছে।

হালদারপুকুর, ভূতীর খাল, আম্রকানন প্রভৃতির কথা।

গ্রামে তিন চারিটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। তন্মধ্যে হালদারপুকুরই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র পুষ্করিণী অনেক আছে। তাহাদিগের কোন কোনটি আবার শতদল কমল, কুমুদ ও কহ্লারশ্রেণী বক্ষে ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। গ্রামে ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটির ও সমাধির অসদ্ভাব নাই। পূর্ব্বে উহার সংখ্যা অনেক অধিক ছিল। রামানন্দ শাঁখারির ভগ্ন দেউল, ফকির দত্তের জীর্ণ রাসমঞ্চ, জঙ্গলাকীর্ণ ইষ্টকের স্তূপ এবং পরিত্যক্ত দেবালয়সমূহ নানা স্থলে বিদ্যমান থাকিয়া ঐ বিষয়ের এবং গ্রামের পূর্ব্বসমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে। গ্রামের ঈশান ও বায়ুকোণে 'বুধুই মোড়ল' ও 'ভূতীর খাল' নামক দুইটি শ্মশান বর্ত্তমান। শেষোক্ত

স্থানের পশ্চিমে গোচর প্রান্তর, মাণিকরাজা-প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য আম্রকানন এবং আমোদর নদ বিদ্যমান আছে। ভূতীর খাল দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া গ্রামের অনতিদূরে উক্ত নদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

কামারপুকুরের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে ভূরস্থবো নামক গ্রাম। শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক বিশেষ ধনাঢ্য ব্যক্তির তথায় বাস ছিল। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকলে ইনি 'মাণিক-রাজা' নামে পরিচিত ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত আম্রকানন ভিন্ন 'সুখসায়ের', 'হাতিসায়ের' প্রভৃতি বৃহৎ দীর্ঘিকাসকল এখনও ইঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। শুনা যায়, ইঁহার বাটীতে লক্ষ ব্রাহ্মণ অনেকবার নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করিয়াছিলেন।

ভূরস্থবোর মাণিকরাজা।

কামারপুকুরের দক্ষিণপূর্ব্ব বা অগ্নিকোণে মান্দারণ গ্রাম। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকলকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে কোন কালে এখানে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্রকায় আমোদর নদের গতি কৌশলে পরিবর্ত্তিত করিয়া উক্ত গড়ের পরিখায় পরিণত করা হইয়াছিল।

গড় মান্দারণ।

মান্দারণ দুর্গের ভগ্ন তোরণ, স্তূপ ও পরিখা এবং উহার অনতিদূরে শৈলেশ্বর মহাদেবের মন্দির এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া পাঠানদিগের রাজত্বকালে এই সকল স্থানের প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করিতেছে। গড়মান্দারণের পার্শ্ব দিয়াই বর্দ্ধমানে গমনাগমন করিবার পূর্ব্বোক্ত পথ প্রসারিত রহিয়াছে। ঐ পথের দুই ধারে

অনেকগুলি বৃহৎ দীর্ঘিকা নয়নগোচর হয়। উক্ত গড় হইতে প্রায় নয় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত উচালন নামক স্থানের দীর্ঘিকাই তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উক্ত পথের এক স্থানে একটি ভগ্ন হস্তিশালাও লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ সকল দর্শনে বুঝিতে পারা যায়, যুদ্ধবিগ্রহের সৌকর্য্যার্থেই এই পথ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। মোগলমারির প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র পথিমধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

উচালনের দীঘি ও মোগল-মারির যুদ্ধক্ষেত্র।

কামারপুকুরের পশ্চিমে প্রায় এক ক্রোশ দূরে সাতবেড়ে, নারায়ণপুর ও দেরে নামক তিনখানি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত আছে। এই গ্রামসকল এককালে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। দেরের দীর্ঘিকা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেবালয় এবং অন্য নানা বিষয় দেখিয়া ঐ কথা অনুমিত হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে উক্ত গ্রামত্রয় ভিন্ন জমিদারীভুক্ত ছিল এবং উহার জমীদার রামানন্দ রায় সাতবেড়ে নামক গ্রামে বাস করিতেছিলেন। এই জমীদার বিশেষ ধনাঢ্য না হইলেও বিষম প্রজাপীড়ক ছিলেন। কোন কারণে কাহারও উপর কুপিত হইলে, ইনি ঐ প্রজাকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। ইঁহার কন্যাপুত্রাদির মধ্যে কেহই জীবিত ছিল না। লোকে বলে, প্রজাপীড়ন অপরাধেই ইনি নির্ব্বংশ হইয়াছিলেন, এবং মৃত্যুর পরে ইঁহার বিষয় সম্পত্তি অপরের হস্তগত হইয়াছিল।

দেরে গ্রামের জমীদার রামানন্দ রায়ের কথা।

প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে মধ্যবিৎ অবস্থাসম্পন্ন, ধর্ম্মনিষ্ঠ এক

ব্রাহ্মণপরিবারের দেরে গ্রামে বাস ছিল। ইঁহারা সদাচারী, কুলীন এবং শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। ইঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত শিবালয়সমন্বিত পুষ্করিণী এখনও 'চাটুর্য্যে পুকুর' নামে খ্যাত থাকিয়া ইঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। উক্তবংশীয় শ্রীযুক্ত মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের তিন পুত্র এবং এক কন্যা হইয়াছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ক্ষুদিরাম সম্ভবতঃ সন ১১৮১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে রামশীলা নাম্নী কন্যার এবং নিধিরাম ও কানাইরাম নামক পুত্রদ্বয়ের জন্ম হইয়াছিল।

দেরে গ্রামের মাণিকরাম-চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত অর্থকরী কোনরূপ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন কি না জানা যায় না। কিন্তু সত্যনিষ্ঠা, সন্তোষ, ক্ষমা এবং ত্যাগ প্রভৃতি যে গুণসমূহ সদ্‌ব্রাহ্মণের স্বভাবসিদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আছে, বিধাতা তাঁহাকে ঐ সকল গুণ প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘ এবং সবল ছিলেন, কিন্তু স্থূলকায় ছিলেন না; গৌরবর্ণ এবং প্রিয়দর্শন ছিলেন। বংশানুগত শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তির তাঁহাতে বিশেষ প্রকাশ ছিল এবং তিনি নিত্যকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া প্রতিদিন পুষ্পচয়নপূর্ব্বক ৺রঘুবীরের পূজান্তে জলগ্রহণ করিতেন। শূদ্রের নিকট হইতে দান গ্রহণ দূরে থাকুক, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেন নাই; এবং যে সকল ব্রাহ্মণ পণ গ্রহণ করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিত, তাহাদিগের হস্তে জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করিতেন না। ঐরূপ নিষ্ঠা ও সদাচারের

তৎপুত্র ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কথা।

জন্য গ্রামবাসীরা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সম্মানের চক্ষে দর্শন করিত।

পিতার মৃত্যুর পরে সংসার ও বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের স্কন্ধেই পতিত হইয়াছিল এবং ধর্ম্মপথে অবিচলিত থাকিয়া তিনি ঐ সকল কার্য্য যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিলেও, তাঁহার পত্নী অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং আন্দাজ পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে তিনি পুনরায় দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার এই পত্নীর নাম শ্রীমতী চন্দ্রমণি ছিল; কিন্তু বাটীতে ইঁহাকে সকলে 'চন্দ্রা' বলিয়াই সম্বোধন করিত। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর পিত্রালয় সরাটিমায়াপুর নামক গ্রামে অবস্থিত ছিল। তিনি সুরূপা, সরলা এবং দেবদ্বিজপরায়ণা ছিলেন। কিন্তু হৃদয়ের অসীম শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালবাসাই তাঁহার বিশেষ গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, এবং ঐ সকলের জন্যই তিনি সংসারে সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সন ১১৯৭ সালে শ্রীমতী চন্দ্রমণি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সন ১২০৫ সালে বিবাহের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র ছিল। সম্ভবতঃ সন ১২১১ সালে তাঁহার প্রথম পুত্র রামকুমার জন্মগ্রহণ করে। উহার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে শ্রীমতী কাত্যায়নী নাম্নী কন্যার এবং সন ১২৩২ সালে দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বরের মুখাবলোকন করিয়া তিনি আনন্দিতা হইয়াছিলেন।

ক্ষুদিরাম-গৃহিণী শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী।

ধর্ম্মপথে থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যে কতদূর কঠিন

কার্য্য, তাহা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের হৃদয়ঙ্গম হইতে বিলম্ব হয় নাই।

জমীদারের সহিত বিবাদে ক্ষুদিরামের সর্ব্বস্বান্ত হওয়া।

সম্ভবতঃ তাঁহার কন্যা কাত্যায়নীর জন্মপরিগ্রহের কিঞ্চিৎকাল পরে তিনি বিষম পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছিলেন। গ্রামের জমীদার রামানন্দ রায়ের প্রজাপীড়নের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। দেরেপুরের কোন ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি এখন মিথ্যাপবাদে আদালতে মোকদ্দমা আনয়ন করিলেন এবং বিশ্বস্ত সাক্ষীর প্রয়োজন দেখিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামকে তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষুদিরাম আইন আদালতকে সর্ব্বদা ভীতির চক্ষে দেখিতেন এবং ঘটনা সত্য হইলেও ইতিপূর্ব্বে কখন কাহারও বিরুদ্ধে উহাদিগের আশ্রয় লইতেন না। সুতরাং জমীদারের পূর্ব্বোক্ত অনুরোধে আপনাকে বিশেষ বিপন্ন জ্ঞান করিলেন। কিন্তু মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান না করিলে জমীদারের বিষম কোপে পতিত হইতে হইবে, একথা স্থির জানিয়াও তিনি উহাতে কিছুতেই সম্মত হইতে পারিলেন না। অগত্যা এস্থলে যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইল; জমীদার তাঁহারও বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রদান-পূর্ব্বক নালিশ রুজু করিলেন এবং মোকদ্দমায় জয়ী হইয়া তাঁহার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি নিলাম করিয়া লইলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের দেরেপুরে থাকিবার বিন্দুমাত্র স্থান রহিল না। গ্রামবাসী সকলে তাঁহার দুঃখে যথার্থ কাতর হইলেও তাঁহাকে জমীদারের বিরুদ্ধে কোনই সহায়তা করিতে পারিল না।

ঐরূপে প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম

একালে নিঃস্ব হইলেন। পিতৃপুরুষদিগের অধিকারি-স্বত্বে এবং নিজ উপার্জ্জনের ফলে যে সম্পত্তি * তিনি এতকাল ধরিয়া সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বায়ুতাড়িত ছিন্নাভ্রের ন্যায় উহা এখন কোথায় এককালে বিলীন হইল। কিন্তু ঐ ঘটনা তাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সক্ষম হইল না। তিনি ৺রঘুবীরের শ্রীপাদপদ্মে একান্ত শরণ গ্রহণ করিলেন এবং স্থিরচিত্তে নিজ কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক দুর্জ্জনকে দূর পরিহার করিবার নিমিত্ত পৈতৃক ভিটা ও গ্রাম হইতে চিরকালের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ক্ষুদিরামের দেরে গ্রাম পরিত্যাগ।

কামারপুকুরের শ্রীযুক্ত সুখলাল গোস্বামিজীর কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সমস্বভাববিশিষ্ট ছিলেন বলিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের সহিত ইঁহার পূর্ব্ব হইতে বিশেষ সৌহৃদ্য উপস্থিত হইয়াছিল। বন্ধুর ঐরূপ বিপদের কথা শুনিয়া ইনি বিশেষ বিচলিত হইলেন এবং নিজ বাটীর একাংশে কয়েকখানি চালা ঘর চিরকালের জন্য ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে কামারপুকুরে আসিয়া বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম উহাতে অকূলে কূল পাইলেন; এবং শ্রীভগবানের অচিন্ত্য লীলাতেই পূর্ব্বোক্ত অনুরোধ উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া, কৃতজ্ঞহৃদয়ে কামারপুকুরে আগমনপূর্ব্বক তদবধি ঐ স্থানেই বাস

সুখলাল গোস্বামীর আমন্ত্রণে ক্ষুদিরামের কামারপুকুরে আগমন ও বাস।

---

* হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের নিকট শুনিয়াছি, দেরেপুরে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের প্রায় দেড়শত বিঘা জমী ছিল।

করিতে লাগিলেন। বন্ধুপ্রাণ সুখলাল উহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষুদিরামের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য এক বিঘা দশ ছটাক ধান্যজমী তাঁহাকে চিরকালের জন্য প্রদান করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

কামারপুকুরে ধর্ম্মের সংসার।

দশ বৎসরের পুত্র রামকুমার ও চারি বৎসরের কন্যা কাত্যায়নীকে সঙ্গে লইয়া সস্ত্রীক ক্ষুদিরাম যে দিন কামারপুকুরে আসিয়া পর্ণকুটীরে বাস করিলেন, তাঁহাদিগের সেদিনকার মনোভাব বলিবার নহে। ঈর্ষাদ্বেষপূর্ণ সংসার সেদিন তাঁহাদিগের নিকট অন্ধতমসাবৃত বিকট শ্মশানতুল্য; স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, ন্যায়পরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণনিচয় তথায় মধ্যে মধ্যে ক্ষীণালোক বিস্তার করিয়া হৃদয়ে সুখাশার উদয় করিলেও, পরক্ষণেই উহা কোথায় বিলীন হয় এবং যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই সেখানে বিরাজ করিতে থাকে। পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া ঐরূপ নানা কথা যে তাঁহাদিগের মনে এখন উদিত হইয়াছিল একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কারণ, দুঃখ-দুর্দ্দিনে পড়িয়াই মানব সংসারের অসারতা ও অনিত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি করে! অতএব শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের প্রাণে এখন যে বৈরাগ্যের উদয় হইবে ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। আবার, পূর্ব্বোক্ত অযাচিত অপ্রত্যাশিত ভাবে আশ্রয় লাভের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণ অন্তর যে এখন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও নির্ভরতায় পূর্ণ হইয়াছিল, একথা বলিতে হইবে না। সুতরাং

কামারপুকুরে আসিয়া ক্ষুদিরামের বানপ্রস্থের ন্যায় জীবন যাপন করিবার কারণ।

৺ রঘুবীরের হস্তে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক সংসারের পুনরায় উন্নতিসাধনে উদাসীন হইয়া তিনি যে এখন শ্রীভগবানের সেবা-পূজাতে দিন কাটাইতে থাকিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? বাস্তবিক সংসারে থাকিলেও তিনি এখন হইতে অসংসারী হইয়া প্রাচীন কালের বানপ্রস্থসকলের ন্যায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একটি ঘটনায় শ্রীযুত ক্ষুদিরামের ধর্ম্মবিশ্বাস অধিকতর গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল। কার্য্যবশতঃ একদিন তাঁহাকে গ্রামান্তরে যাইতে হইয়াছিল। তথা হইতে ফিরিবার কালে তিনি শ্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে বৃক্ষতলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। জনশূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর তাঁহার চিন্তাভারাক্রান্ত মনে শান্তি প্রদান করিল এবং নির্ম্মল বায়ু ধীরে প্রবাহিত হইয়া তাঁহার শরীর স্নিগ্ধ করিতে লাগিল। তাঁহার শয়নেচ্ছা বলবতী হইল এবং শয়ন করিতে না করিতে তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি স্বপ্নাবেশে দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার অভীষ্টদেব নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম-তনু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যেন দিব্য বালকবেশে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন এবং স্থানবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, 'আমি এখানে অনেক দিন অযত্নে অনাহারে আছি, আমাকে তোমার বাটীতে লইয়া চল, তোমার সেবা গ্রহণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।' ঐ কথা শুনিয়া ক্ষুদিরাম একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে বারংবার প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, 'প্রভু, আমি ভক্তিহীন ও নিতান্ত দরিদ্র, আমার গৃহে আপনার যোগ্য সেবা কখনই সম্ভবে না, অধিকন্তু

অদ্ভুত উপায়ে ক্ষুদিরামের ৺ রঘুবীর শিলা লাভ।

সেবাপরাধী হইয়া আমাকে নিরয়গামী হইতে হইবে, অতএব ঐরূপ অন্যায় অনুরোধ কেন করিতেছেন?' বালক-বেশী শ্রীরামচন্দ্র তাহাতে প্রসন্নমুখে তাঁহাকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, 'ভয় নাই, আমি তোমার ত্রুটি কখনও গ্রহণ করিব না, আমাকে লইয়া চল!' ক্ষুদিরাম শ্রীভগবানের ঐরূপ অযাচিত কৃপায় আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলেন না, প্রাণের আবেগে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। এমন সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

জাগরিত হইয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ভাবিতে লাগিলেন, এ কি অদ্ভুত স্বপ্ন, হায় হায় কখনও কি তাঁহার সত্য সত্য ঐরূপ সৌভাগ্যের উদয় হইবে? ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাঁহার দৃষ্টি নিকটবর্ত্তী ধান্যক্ষেত্রে পতিত হইল এবং বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ঐ স্থানটিই তিনি স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন। কৌতূহল-পরবশ হইয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন এবং ঐ স্থানে পৌঁছিবা-মাত্র দেখিতে পাইলেন, একটি সুন্দর শালগ্রাম শিলার উপরে এক ভুজঙ্গ ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে! তখন শিলা হস্তগত করিতে তাঁহার মনে প্রবল বাসনা উপস্থিত হইল এবং তিনি দ্রুতপদে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভুজঙ্গ অন্তর্হিত হইয়াছে ও তাহার বিবরমুখে শালগ্রামটি পড়িয়া রহিয়াছে। স্বপ্ন অলীক নহে ভাবিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের হৃদয় তখন বিষম উৎসাহে পূর্ণ হইল এবং আপনাকে দেবাদিষ্ট জ্ঞানে তিনি ভুজঙ্গদংশনের ভয় না রাখিয়া 'জয় রঘুবীর' বলিয়া চীৎকারপূর্ব্বক শিলা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ ক্ষুদিরাম শিলার লক্ষণ সকল নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, বাস্তবিকই উহা 'রঘুবীর' নামক শিলা! তখন আনন্দে বিস্ময়ে

অধীর হইয়া তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং যথাশাস্ত্র সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উহাকে নিজ গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক নিত্য পূজা করিতে লাগিলেন। ৺ রঘুবীরকে ঐরূপ অদ্ভুত উপায়ে পাইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত ক্ষুদিরাম নিজ অভীষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রকে পূজা ভিন্ন, ঘট প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক ৺শীতলাদেবীকে নিত্য পূজা করিতেছিলেন।

সাংসারিক কষ্টের মধ্যে ক্ষুদিরামের অবিচলতা ও ঈশ্বর-নির্ভরতা।

একের পর এক করিয়া দুর্দ্দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, ক্ষুদিরামও সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্টে উদাসীন থাকিয়া একমাত্র ধর্ম্মকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কাল কাটাইতে লাগিলেন। সংসারে কোন কোন দিন এককালে অন্নাভাব হইয়াছে; পতিপ্রাণা চন্দ্রাদেবী ব্যাকুলহৃদয়ে ঐ কথা স্বামীকে নিবেদন করিয়াছেন; শ্রীযুত ক্ষুদিরাম কিন্তু তাহাতেও বিচলিত না হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বলিয়াছেন, "ভয় কি, যদি ৺রঘুবীর উপবাসী থাকেন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার সহিত উপবাসী থাকিব।" সরলপ্রাণা চন্দ্রাদেবী তাহাতে স্বামীর ন্যায় ৺রঘুবীরের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া গৃহকর্ম্মে নিরতা হইয়াছেন—আহার্য্যের সংস্থানও সেদিন কোনরূপে হইয়া গিয়াছে!

লক্ষ্মীজলায় ধান্যক্ষেত্র।

ঐরূপ একান্ত অন্নাভাব কিন্তু শ্রীযুত ক্ষুদিরামকে অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার বন্ধু শ্রীযুত সুখলাল গোস্বামী তাঁহাকে লক্ষ্মীজলা নামক স্থানে যে এক বিঘা দশ ছটাক ধান্য-জমী প্রদান করিয়াছিলেন, ৺রঘুবীরের প্রসাদে তাহাতে এখন হইতে এত ধান্য হইতে লাগিল যে, উহাতে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের অভাব

সংবৎসরের জন্য নিবারিত হওয়া ভিন্ন কিছু কিছু উদ্বৃত্ত হইয়া অতিথি-অভ্যাগতের সেবাও চলিয়া যাইতে লাগিল। কৃষাণদিগকে পারিশ্রমিক দিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম উক্ত জমীতে চাষ করাইতেন এবং ক্ষেত্র কর্ষিত হইয়া বপনকাল উপস্থিত হইলে, ৺রঘুবীরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং কয়েক গুচ্ছ ধান উহাতে প্রথমে রোপণ করিতেন, পরে কৃষকদিগকে ঐ কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে বলিতেন।

ক্ষুদিরামের ঈশ্বরভক্তির বৃদ্ধি ও দিব্যদর্শন লাভ। প্রতিবেশিগণের তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা।

দিন মাস অতীত হইয়া ক্রমে দুই তিন বৎসর কাটিয়া গেল এবং ৺রঘুবীরের মুখ চাহিয়া প্রায় আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিলেও শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের সংসারে মোটা অন্নবস্ত্রের অভাব হইল না। কিন্তু ঐ দুই তিন বৎসরের কঠোর শিক্ষাপ্রভাবে তাঁহার হৃদয়ে এখন যে, শান্তি, সন্তোষ ও ঈশ্বরনির্ভরতা নিরন্তর প্রবাহিত থাকিল, তাহা স্বল্প লোকের ভাগেই ঘটিয়া থাকে। অন্তর্মুখ অবস্থায় থাকা তাঁহার মনের স্বভাব হইয়া উঠিল এবং উহার প্রভাবে তাঁহার জীবনে নানা দিব্যদর্শন সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে সন্ধ্যা করিতে বসিয়া যখন তিনি ৺গায়ত্রী দেবীর ধ্যানাবৃত্তিপূর্ব্বক তচ্চিন্তায় মগ্ন হইতেন তখন বক্ষঃস্থল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত এবং মুদিত নয়ন অবিরল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিত! প্রত্যুষে যখন তিনি সাজিহস্তে ফুল তুলিতে যাইতেন তখন দেখিতেন তাঁহার আরাধ্যা ৺শীতলা দেবী যেন অষ্টবর্ষীয়া কন্যারূপিণী হইয়া রক্তবস্ত্র ও নানা অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন এবং পুষ্পিত

বৃক্ষের শাখাসকল নত করিয়া ধরিয়া তাঁহাকে ফুল তুলিতে সহায়তা করিতেছেন! ঐ সকল দিব্যদর্শনে তাঁহার অন্তর এখন সর্ব্বদা উল্লাসে পূর্ণ হইয়া থাকিত এবং তাঁহার অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি বদনে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে এক অপূর্ব্ব দিব্যাবেশে নিরন্তর পরিবৃত করিয়া রাখিত। তাঁহার সৌম্য শান্ত মুখ দর্শনে গ্রামবাসীরা উহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তাঁহাকে ক্রমে ঋষির ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিলে তাহারা বৃথালাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে উত্থান ও সম্ভাষণ করিত; তাঁহার স্নানকালে সেই পুষ্করিণীতে অবগাহন করিতে তাহারা সঙ্কোচ বোধ করিয়া সসম্ভ্রমে অপেক্ষা করিত; তাঁহার আশীর্ব্বাণী নিশ্চিত ফলদান করিবে ভাবিয়া তাহারা বিপদে সম্পদে উহার প্রত্যাশী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত।

শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীকে প্রতিবেশিগণ যে চক্ষে দেখিত।

স্নেহ ও সরলতার মূর্ত্তি শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীও নিজ দয়া ও ভালবাসায় তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের মাতৃভক্তির যথার্থই অধিকারিণী হইলেন। কারণ সম্পদ্ বা আপৎকালে তাঁহার ন্যায় হৃদয়ের সহানুভূতি তাহারা আর কোথাও পাইত না। দরিদ্রেরা জানিত, শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর নিকট তাহারা যখনই উপস্থিত হইবে, তখন শুদ্ধ যে এক মুঠা খাইতে পাইবে, তাহা নহে; কিন্তু উহার সহিত এত অকৃত্রিম যত্ন ও ভালবাসা পাইবে যে, তাহাদিগের অন্তর পরম পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। ভিক্ষুক সাধুরা জানিত, এ বাটীর দ্বার তাহাদিগের নিমিত্ত সর্ব্বদা উন্মুক্ত আছে। প্রতিবেশী বালকবালিকারা জানিত চন্দ্রাদেবীর

নিকটে তাহারা যে বিষয়ের জন্য আবদার করুক না কেন তাহা কোন না কোন উপায়ে পূর্ণ হইবেই হইবে। ঐরূপে প্রতিবেশীদিগের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শ্রীযুত ক্ষুদিরামের পর্ণকুটীরে যখন তখন আসিয়া উপস্থিত হইত এবং দুঃখদারিদ্র্য বিদ্যমান থাকিলেও উহা এক অপূর্ব্ব শান্তির আলোকে নিরন্তর উদ্ভাসিত হইয়া থাকিত।

ক্ষুদিরামের ভগিনী শ্রীমতী রামশীলার কথা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি শ্রীযুত ক্ষুদিরামের রামশীলা নাম্নী এক ভগিনী এবং নিধিরাম ও কানাইরাম বা রামকানাই নামক দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। দেরেপুরের জমীদারের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইয়া যখন তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, তখন তাঁহার উক্ত ভগিনীর বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বৎসর এবং ভ্রাতৃদ্বয়ের ত্রিশ ও পঁচিশ বৎসর হইবে। তাঁহারা সকলেই তখন বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন। কামারপুকুরের প্রায় ছয় ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত ছিলিমপুরে ৺ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীমতী রামশীলার বিবাহ হইয়াছিল এবং রামচাঁদ নামক এক পুত্র ও হেমাঙ্গিনী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। উক্ত বিপদের সময় রামচাঁদের বয়স আন্দাজ একুশ বৎসর এবং হেমাঙ্গিনীর ষোল বৎসর ছিল। শ্রীযুক্ত রামচাঁদ তখন মেদিনীপুরে মোক্তারি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীর দেরেপুরে মাতুলালয়েই জন্ম হইয়াছিল এবং ভ্রাতা অপেক্ষাও তিনি মাতুলদিগের অধিকতর স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ইঁহাকে কন্যা-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া, বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, কামারপুকুরের প্রায় আড়াই ক্রোশ

উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত সিহর গ্রামের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে স্বয়ং সম্প্রদান করিয়াছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া ইনি ক্রমে রাঘব, রামরতন, হৃদয়রাম ও রাজারাম নামে চারি পুত্রের জননী হইয়াছিলেন।

শ্রীযুত ক্ষুদিরামের নিধিরাম নামক ভ্রাতার কোন সন্তান হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই; কিন্তু সর্ব্বকনিষ্ঠ কানাইরামের রামতারক ওরফে হলধারী এবং কালিদাস নামে দুই পুত্র হইয়াছিল। কানাইরাম ভক্তিমান্ ও ভাবুক ছিলেন। এক সময়ে কোন স্থানে ইনি যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনের অভিনয় হইতেছিল। উহা শুনিতে শুনিতে তিনি এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে কৈকেয়ীর শ্রীরামচন্দ্রকে বনে পাঠাইবার মন্ত্রণা চেষ্টাদিকে সত্য জ্ঞান করিয়া ঐ ভূমিকার অভিনেতাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, পৈতৃক সম্পত্তি হারাইবার পরে নিধিরাম ও কানাইরাম দেরেপুর পরিত্যাগ করিয়া সম্ভবতঃ যে যে গ্রামে তাঁহাদিগের শ্বশুরালয় ছিল, সেই সেই গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ক্ষুদিরামের ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা।

শ্রীমতী রামশীলার পুত্র শ্রীযুক্ত রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেদিনীপুরে মোক্তারি করিবার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ব্যবসায়সূত্রে ইনি ক্রমে মেদিনীপুরে বাস করিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন মাতুলদিগের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া ইনি শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামকে মাসিক পনর টাকা এবং

ক্ষুদিরামের ভাগিনেয় রামচাঁদ।



ঈশানকোণে অবস্থিত পুষ্করিণীর পাড় হইতে ঠাকুরের কামার পুকুরের কুটীর।

নিধিরাম ও কানাইরামের প্রত্যেককে মাসিক দশ টাকা করিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম, ভাগিনেয়ের কিছুকাল সংবাদ না পাইলেই চিন্তিত হইয়া মেদিনীপুরে উপস্থিত হইতেন এবং দুই চারি দিন তাঁহার আলয়ে কাটাইয়া কামারপুকুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। একবার ঐরূপে মেদিনীপুর আগমনকালে তাঁহার সম্বন্ধে একটি বিশেষ ঘটনা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। ঘটনাটি শ্রীযুত ক্ষুদিরামের আন্তরিক দেবভক্তির পরিচায়ক বলিয়া আমরা উহার এখানে উল্লেখ করিলাম।

ক্ষুদিরামের দেবভক্তির পরিচায়ক ঘটনা।

কামারপুকুরের প্রায় চল্লিশ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে মেদিনীপুর অবস্থিত। রামচাঁদ ও তাহার পরিবারবর্গের কুশল-সংবাদ অনেক দিন না পাওয়ায় চিন্তিত হইয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম একদিন ঐ স্থানে যাইবার জন্য বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন মাঘ বা ফাল্গুন মাস হইবে। বিল্ববৃক্ষের পত্রসকল এই সময় ঝরিয়া পড়ে এবং যতদিন না নবপত্রোদ্গম হয় ততদিন লোকের ৺শিবপূজা করিবার বিশেষ কষ্ট হয়। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ঐ কষ্ট কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছিলেন।

অতি প্রত্যুষে বহির্গত হইয়া তিনি প্রায় দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া একটি গ্রামে পৌঁছিলেন এবং তথাকার বিল্ব-বৃক্ষ সকল নবীন পত্রাভরণে ভূষিত দেখিয়া তাঁহার প্রাণ উল্লসিত হইয়া উঠিল। তখন মেদিনীপুর যাইবার কথা এককালে বিস্মৃত হইয়া তিনি গ্রাম হইতে একটি নূতন ঝুড়ি ও একখানি গামছা ক্রয় করিয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীর জলে বেশ করিয়া ধৌত করিলেন। পরে

নবীন বিল্বপত্রে ঝুড়িটি পূর্ণ করিয়া ভিজা গামছাখানি উহার উপর চাপা দিয়া অপরাহ্ন প্রায় তিন ঘটিকার সময় কামারপুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটী পৌছিয়াই শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম স্নান সমাপন-পূর্ব্বক ঐ পত্রসকল লইয়া মহানন্দে ৺মহাদেব ও ৺শীতলা মাতার বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পূজা করিলেন; পরে স্বয়ং আহারে বসিলেন। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী তখন অবসর লাভ করিয়া তাঁহাকে মেদিনীপুর না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আদ্যোপান্ত সকল কথা শ্রবণ করিয়া বিল্বপত্রে দেবার্চ্চনা করিবার লোভে এতটা পথ অতিবাহন করিয়াছেন জানিয়া যারপর নাই বিস্মিতা হইলেন। পরদিন প্রত্যূষে শ্রীযুত ক্ষুদিরাম পুনরায় মেদিনীপুরে যাত্রা করিলেন।

রামকুমার ও কাত্যায়নীর বিবাহ।

এক দুই করিয়া ক্রমে কামারপুকুরে শ্রীযুত ক্ষুদিরামের ছয় বৎসর অতিবাহিত হইল। তাঁহার পুত্র রামকুমার এখন ষোড়শ বর্ষে এবং কন্যা কাত্যায়নী একাদশ বর্ষে পদার্পন করিল। কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে দেখিয়া তিনি এখন পাত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কামারপুকুরের উত্তর-পশ্চিম এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত আনুর গ্রামের শ্রীযুক্ত কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়কে কন্যা সম্প্রদান-পূর্ব্বক কেনারামের ভগিনীর সহিত নিজ পুত্র রামকুমারের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। রামকুমার নিকটবর্ত্তী গ্রামের চতুষ্পাঠীতে ইতিপূর্ব্বে ব্যাকরণ ও সাহিত্যপাঠ সমাপ্ত করিয়া এখন স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

ক্রমে আরও তিন চারি বৎসর অতিক্রান্ত হইল। ৺রঘুবীরের

প্রসাদে শ্রীযুত ক্ষুদিরামের সংসারে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুবন্দোবস্ত হইয়াছে এবং তিনিও নিশ্চিন্ত মনে শ্রীভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত আছেন। ঘটনার মধ্যে ঐ চারি বৎসরে শ্রীযুত রামকুমার স্মৃতি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া সংসারের আর্থিক উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুত ক্ষুদিরামের পরম বন্ধু সুখলাল গোস্বামী উহার কোন সময়ে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুত সুখলালের মৃত্যুতে ক্ষুদিরাম যে বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন এ কথা বলা বাহুল্য।

সুখলাল গোস্বামীর মৃত্যু ইত্যাদি।

রামকুমার মানুষ হইয়া সংসারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম নিশ্চিন্ত হইয়া এখন অন্য বিষয়ে মন দিবার অবসর লাভ করিলেন। তীর্থ-দর্শনের জন্য তাঁহার অন্তর এখন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর সম্ভবতঃ সন ১২৩০ সালে তিনি পদব্রজে ৺সেতুবন্ধরামেশ্বর দর্শনে গমন করিলেন এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশের তীর্থসকলে পর্য্যটন করিয়া প্রায় এক বৎসর পরে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ৺সেতুবন্ধ হইতে এই সময়ে তিনি একটি বাণলিঙ্গ কামারপুকুরে আনয়নপূর্ব্বক নিত্য পূজা করিতে থাকেন। ৺রামেশ্বর নামক ঐ বাণলিঙ্গটিকে এখনও কামারপুকুরে ৺রঘুবীর শিলার ও ৺শীতলা দেবীর ঘটের পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী বহুকাল পরে পুনরায় এই সময়ে গর্ভধারণ করিয়া সন ১২৩২ সালে এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। ৺রামেশ্বর তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এই

ক্ষুদিরামের ৺সেতুবন্ধ তীর্থ দর্শন ও রামেশ্বর নামক পুত্রের জন্ম।

পুত্র লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ইহার নাম রামেশ্বর রাখিয়াছিলেন।

রামকুমারের দৈবী-শক্তি।

ঐ ঘটনার পরে প্রায় আট বৎসর কাল পর্য্যন্ত কামারপুকুরের এই দরিদ্র সংসারে জীবনপ্রবাহ প্রায় সমভাবেই বহিয়াছিল। শ্রীযুক্ত রামকুমার স্মৃতির বিধান দিয়া এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি কর্ম্মে এখন উপার্জ্জন করিতেছিলেন। সুতরাং সংসারে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় কষ্ট ছিল না। শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি কর্ম্মে রামকুমার বিশেষ পটু হইয়াছিলেন। শুনা যায়, তিনি ঐ বিষয়ে দৈবী শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে তিনি ইতিপূর্ব্বে আদ্যাশক্তির উপাসনায় বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন এবং উপযুক্ত গুরুর নিকট ৺ দেবীমন্ত্রও গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভীষ্ট দেবীকে নিত্য পূজা করিবার কালে একদিন তাহার অপূর্ব্ব দর্শনলাভ হয় এবং তিনি অনুভব করিতে থাকেন, যেন ৺দেবী নিজ অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার জিহ্বাগ্রে জ্যোতিষশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভের জন্য কোন মন্ত্রবর্ণ লিখিয়া দিতেছেন। তদবধি রোগী ব্যক্তিকে দেখিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন, সে আরোগ্য হইবে কি না এবং ঐ ক্ষমতাপ্রভাবে তিনি এখন যে রোগীর সম্বন্ধে যাহা বলিতে লাগিলেন, তাহাই ফলিয়া যাইতে লাগিল। ঐরূপে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া তাঁহার এই কালে এতদঞ্চলে সামান্য প্রসিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। শুনা যায়, তিনি এই সময়ে কঠিন পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার নিমিত্ত স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত হইতেন এবং জোর রিয়া বলিতেন, এই স্বস্ত্যয়ন বেদীতে যে শস্য ছড়াইতেছি

তাহাতে কলার উদ্গম হইলেই এই ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিবে। ফলেও বাস্তবিক তাহাই হইত। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতার উদাহরণস্বরূপে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শিবরাম চট্টোপাধ্যায় আমাদিগের নিকটে নিম্নলিখিত ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছিলেন—

ঐ শক্তির পরিচায়ক ঘটনাবিশেষ।

কার্য্যোপলক্ষে রামকুমার কলিকাতায় আগমন করিয়া একদিন গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন। কোন ধনী ব্যক্তি ঐ সময়ে সপরিবারে তথায় স্নান করিতে আসিলেন এবং উক্ত ব্যক্তির স্ত্রীর স্নানের জন্য শিবিকা গঙ্গাগর্ভে লইয়া যাওয়া হইলে, উহার মধ্যে বসিয়াই ঐ যুবতী স্নান সমাপন করিতে থাকিলেন। পল্লী-গ্রামবাসী রামকুমার স্নানকালে স্ত্রীলোকদিগের ঐরূপে আবরু রক্ষা কখন নয়নগোচর করেন নাই। সুতরাং বিস্মিত হইয়া উহা দেখিতে দেখিতে শিবিকামধ্যে অবস্থিত যুবতীর মুখকমল ক্ষণেকের নিমিত্ত দেখিতে পাইলেন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত দৈবী শক্তিপ্রভাবে তাঁহার মৃত্যুর কথা জানিতে পারিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—'আহা! আজ যাহাকে এত আদব কায়দায় স্নান করাইতেছে, কাল তাহাকে সর্ব্বজনসমক্ষে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিবে!' ধনী ব্যক্তি ঐ কথা শুনিতে পাইয়া ঐ বাক্য পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীযুত রামকুমারকে নিজালয়ে সাগ্রহে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল, ঘটনা সত্য না হইলে রামকুমারকে বিশেষরূপে অপমানিত করিবেন। যুবতী সম্পূর্ণ সুস্থ থাকায় ঐরূপ ঘটনা হইবার কোন লক্ষণও বাস্তবিক তখন দেখা যায় নাই। কিন্তু ফলে শ্রীযুত

রামকুমার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছিল এবং ঐ ব্যক্তিও তাঁহাকে মান্যের সহিত বিদায় দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঐ শক্তির পরিচায়ক রামকুমারের স্ত্রীর সম্বন্ধীয ঘটনা।

নিজ স্ত্রীর ভাগ্য দর্শন করিয়াও শ্রীযুত রামকুমার এক সময়ে বিষম ফল নির্ণয় করিয়াছিলেন, এবং ঘটনাও কিছুকাল পরে ঐরূপ হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, তাঁহার স্ত্রী বিশেষ সুলক্ষণসম্পন্না ছিলেন। সম্ভবতঃ সন ১২২৬ সালে শ্রীযুত রামকুমার পাণিগ্রহণ করিয়া যেদিন তাঁহার সপ্তমবর্ষীয়া পত্নীকে কামারপুকুরে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে তাঁহার ভাগ্যচক্র উন্নতির পথে আরোহণ করিয়াছিল। তাঁহার পিতার দরিদ্র সংসারেও সেই দিন হইতে ঐরূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, শ্রীযুত ক্ষুদিরামের মেদিনীপুরনিবাসী ভাগিনেয় শ্রীযুত রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাসিক সাহায্য ঐ সময় হইতে আসিতে আরম্ভ হয়। স্ত্রী বা পুরুষ, কোন ব্যক্তির সংসারে প্রথম প্রবেশকালে ঐরূপ শুভফল উপস্থিত হইলে, হিন্দুপরিবারে সকলে তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চক্ষে দেখিয়া থাকে, একথা বলিতে হইবে না। বিশেষতঃ রামকুমারের বালিকা পত্নী তখন আবার এই দরিদ্র সংসারে একমাত্র পুত্রবধূ। সুতরাং বালিকা যে, সকলের বিশেষ আদরের পাত্রী হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। আমরা শুনিয়াছি, ঐরূপ অতিমাত্রায় আদর যত্ন পাইয়া তাহার নানা সদ্‌গুণের সহিত অভিমান ও অনাশ্রবতারূপ দোষদ্বয় প্রশ্রয় পাইয়াছিল। ঐ দোষ সকলের চক্ষে পড়িলেও কেহ কিছু বলিতে বা সংশোধনের চেষ্টা করিতে সাহসী হইত না। কারণ,

সকলে ভাবিত সামান্য দোষ থাকিলেও তাহার আগমনকাল হইতেই কি সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই? সে যাহা হউক, কিছু কাল পরে শ্রীযুত রামকুমার তাঁহার প্রাপ্তযৌবনা স্ত্রীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'সুলক্ষণা হইলেও গর্ভ-ধারণ করিলেই ইহার মৃত্যু হইবে!' পরে বহুকাল গত হইলেও যখন পত্নীর গর্ভ হইল না, তখন তিনি তাঁহাকে বন্ধ্যা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সকালে তাঁহার পত্নী প্রথম ও শেষ বার গর্ভবতী হইয়া সন ১২৫৫ সালে ছত্রিশ বৎসরে এক পরম রূপবান্ পুত্র-প্রসবান্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। এই পুত্রের নাম অক্ষয় রাখা হইয়াছিল। উহা অনেক পরের ঘটনা হইলেও সুবিধার জন্য পাঠককে এখানেই বলিয়া রাখিলাম।

ক্ষুদিরামের পরিবারস্থ সকলের বিশেষত্ব।

শ্রীযুত ক্ষুদিরামের ধর্ম্মের সংসারে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই একটা বিশেষত্ব ছিল। অনুধাবন করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের অন্তর্গত বিশেষত্ব আধ্যাত্মিক রাজ্যের সূক্ষ্ম শক্তিসকলের অধিকার হইতে সর্ব্বথা সমুদ্ভূত হইত। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ও তাঁহার পত্নীর ভিতর ঐরূপ বিশেষত্ব অসাধারণভাবে প্রকাশিত ছিল বলিয়াই বোধ হয় উহা তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততিসকলে অনুগত হইয়াছিল। শ্রীযুত ক্ষুদিরামের সম্বন্ধে উক্ত বিষয়ক অনেক কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি। শ্রীমতী চন্দ্রমণি সম্বন্ধে এখন ঐরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ অযোগ্য হইবে না। ঘটনাটিতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, স্বামীর ন্যায় শ্রীমতী চন্দ্রদেবীতেও দিব্যদর্শন-শক্তি সময়ে সময়ে প্রকাশিত থাকিত। ঘটনাটি রামকুমারের

বিবাহের কিছু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। পঞ্চদশবর্ষীয় রামকুমার তখন চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন ভিন্ন যজমানবাটীসকলে পূজা করিয়া সংসারে যথাসাধ্য সাহায্য করিত।

চন্দ্রাদেবীর দিব্যদর্শন-সম্বন্ধী ঘটনা।

আশ্বিন মাসে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিনে রামকুমার ভূরসুবো নামক গ্রামে যজমানগৃহে উক্ত পূজা করিতে গিয়াছিল। অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলেও পুত্র গৃহে ফিরিতেছে না দেখিয়া শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং গৃহের বাহিরে আসিয়া পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ঐরূপে কাটিবার পরে তিনি দেখিতে পাইলেন প্রান্তরপথ অতিবাহিত করিয়া ভূরসুবোর দিক্ হইতে কে একজন কামারপুকুরে আগমন করিতেছে। পুত্র আসিতেছে ভাবিয়া তিনি উৎসাহে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আগন্তুক ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলেন, সে রামকুমার নহে, এক পরমা সুন্দরী রমণী নানালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া একাকিনী চলিয়া আসিতেছেন। পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী তখন বিশেষ আকুলিতা; সুতরাং ভদ্রবংশীয়া যুবতী রমণীকে গভীর রজনীতে ঐরূপে পথ অতিবাহন করিতে দেখিয়াও বিস্মিতা হইলেন না। সরলভাবে তাঁহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' রমণী উত্তর করিলেন, 'ভূরসুবো হইতে।' শ্রীমতী চন্দ্রা তখন ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার পুত্র রামকুমারের সঙ্গে কি তোমার দেখা হইয়াছিল? সে কি ফিরিতেছে?' অপরিচিতা রমণী তাঁহার পুত্রকে চিনিবেন কিরূপে, একথা

তাঁহার মনে একবারও উদিত হইল না। রমণী তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, 'হাঁ, তোমার পুত্র যে বাটীতে পূজা করিতে গিয়াছে, আমি সেই বাটী হইতেই এখন আসিতেছি। ভয় নাই, তোমার পুত্র এখনই ফিরিবে।' শ্রীমতী চন্দ্রা এতক্ষণে আশ্বস্তা হইয়া অন্য বিষয় ভাবিবার অবসর পাইলেন এবং রমণীর অসামান্য রূপ, বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও নূতন ধরণের অলঙ্কারসকল দেখিয়া এবং মধুর বচন শুনিয়া বলিলেন, 'মা, তোমার বয়স অল্প; এত গহনা গাঁটি পরিয়া এত রাত্রে কোথা যাইতেছ? তোমার কাণে ও কি গহনা?' রমণী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'উহার নাম কুণ্ডল, আমাকে এখনও অনেক দূরে যাইতে হইবে।' শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী তখন তাঁহাকে বিপন্না ভাবিয়া সস্নেহে বলিলেন, 'চল মা, আমাদের ঘরে আজ রাত্রের মত বিশ্রাম করিয়া, কাল যেখানে যাইবার, যাইবে এখন।' রমণী বলিলেন, 'না মা আমাকে এখনি যাইতে হইবে; তোমাদের বাড়ীতে, আমি অন্য সময়ে আসিব।' রমণী ঐরূপ বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীমতী চন্দ্রা দেবীর বাটীর পার্শ্বেই লাহা বাবুদের অনেকগুলি ধান্যের মরাই ছিল, তদভিমুখে চলিয়া যাইলেন। রাস্তা না ধরিয়া লাহা বাবুদের বাটীর দিকে তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া চন্দ্রা দেবী বিস্মিতা হইলেন এবং রমণী পথ ভুলিয়াছে ভাবিয়া, ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না! তখন রমণীর বাক্যসকল স্মরণ করিতে করিতে সহসা তাঁহার প্রাণে উদয় হইল, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করিলাম নাকি? অনন্তর কম্পিতহৃদয়ে স্বামীর পার্শ্বে গমনপূর্ব্বক

তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম সমস্ত শ্রবণ করিয়া 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীই তোমাকে কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন' বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্তা করিলেন। রামকুমারও কিছুক্ষণ পরে বাটীতে ফিরিয়া জননীর নিকটে ঐ কথা শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন।

ক্রমে সন ১২৪১ সাল সমাগত হইল। শ্রীযুত ক্ষুদিরামের জীবনে এই সময়ে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

ক্ষুদিরামের ৺গয়াতীর্থে গমন।

তীর্থদর্শনে তাঁহার অভিলাষ পুনরায় প্রবল ভাব ধারণ করায়, পিতৃপুরুষদিগের উদ্ধারকল্পে তিনি এখন গয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। ষাট বৎসরে পদার্পণ করিলেও তিনি পদব্রজে ঐ ধামে গমন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। তাঁহার ভাগিনেয়ী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র শ্রীযুত হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় তাঁহার গয়াধাম যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত ঘটনা আমাদিগের নিকটে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

নিজ দুহিতা শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবীর বিশেষ পীড়ার সংবাদ পাইয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম এই সময়ে একদিন আনুর গ্রামে

ক্ষুদিরামের গয়া গমনসম্বন্ধে হৃদয়রাম-কথিত ঘটনা।

তাঁহাকে দেখিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীমতী কাত্যায়নীর বয়স তখন আন্দাজ পঁচিশ বৎসর হইবে। পীড়িতা কন্যার হাবভাব ও কথাবার্ত্তায় তাঁহার নিশ্চয় ধারণা হইল, তাহার শরীরে কোন ভূতযোনির আবেশ হইয়াছে। তখন সমাহিতচিত্তে শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া তিনি কন্যাশরীরে প্রবিষ্ট জীবের উদ্দেশে

বলিলেন, 'তুমি দেবতা বা উপদেবতা যাহাই হও, কেন আমার কন্যাকে এইরূপে কষ্ট দিতেছ? অবিলম্বে ইহার শরীর ছাড়িয়া অন্যত্র গমন কর।' তাঁহার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া উক্ত জীব ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া শ্রীমতী কাত্যায়নীর শরীরাবলম্বনে উত্তর করিল, 'গয়ায় পিণ্ডদানে প্রতিশ্রুত হইয়া যদি আপনি আমার বর্ত্তমান কষ্টের অবসান করেন, তাহা হইলে আমি আপনার দুহিতার শরীর এখনি ছাড়িতে স্বীকৃত হইতেছি। আপনি যখনি ঐ উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বাহির হইবেন, তখন হইতে ইহার আর কোন অসুস্থতা থাকিবেনা, একথা আমি আপনার নিকটে অঙ্গীকার করিতেছি।' অনন্তর শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ঐ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, 'আমি যত শীঘ্র পারি ৺গয়াধামে গমনপূর্ব্বক তোমার অভিলাষ সম্পাদন করিব; এবং পিণ্ডদানের পরে তুমি যে নিশ্চয় উদ্ধার হইলে, ঐ সম্বন্ধে কোনরূপ নিদর্শন পাইলে বিশেষ সুখী হইব।' তখন প্রেত বলিল, 'ঐ বিষয়ের নিশ্চিত প্রমাণ স্বরূপে সম্মুখস্থ নিম্ব-বৃক্ষের বৃহত্তম ডালটি আমি ভাঙ্গিয়া যাইব, জানিবেন।' হৃদয়রাম বলিতেন, উক্ত ঘটনাই শ্রীযুত ক্ষুদিরামকে ৺গয়াধামে যাত্রা করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল এবং উহার কিছুকাল পরে উক্তবৃক্ষের ডালটি সহসা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, সকলে ঐ প্রেতের উদ্ধার হইবার কথা নিঃসংশয়ে জানিতে পারিয়াছিল। শ্রীমতী কত্যায়নী দেবীও তদবধি সম্পূর্ণরূপে নীরোগ হইয়াছিলেন। হৃদয়রাম-কথিত পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটি কতদূর সত্য বলিতে পারি না, কিন্তু শ্রীযুত ক্ষুদিরাম যে এই সময়ে ৺গয়া দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, একথায় কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সন ১২৪১ সালের শীতের কোন সময়ে শ্রীযুত ক্ষুদিরাম বারাণসী * ও ৺গয়াধাম দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন।

গয়াধামে ক্ষুদিরামের দেব-স্বপ্ন।

প্রথমোক্ত স্থানে ৺বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া যখন তিনি গয়াক্ষেত্রে পৌঁছিলেন, তখন চৈত্র মাস পড়িয়াছে। মধু মাসে ঐ ক্ষেত্রে পিণ্ড প্রদানে পিতৃপুরুষ সকলের অক্ষয় পরিতৃপ্তি হয় জানিয়াই বোধ হয় তিনি ঐ মাসে গয়ায় আগমন করিয়াছিলেন। প্রায় এক মাস কাল তথায় অবস্থানপূর্ব্বক তিনি যথাবিহিত ক্ষেত্রকার্য্যসকলের অনুষ্ঠান করিয়া, পরিশেষে ৺গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ড প্রদান করিলেন। ঐরূপে যথাশাস্ত্র পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরামের বিশ্বাসী হৃদয়ে ঐ দিন যে কতদূর তৃপ্তি ও শান্তি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। পিতৃঋণ যথাসাধ্য পরিশোধ করিয়া তিনি যেন আজ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন; এবং শ্রীভগবান্ তাঁহার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে ঐ কার্য্য সমাধা করিতে শক্তি প্রদান করিয়াছেন ভাবিয়া, তাঁহার কৃতজ্ঞ অন্তর অভূতপূর্ব্ব দীনতা ও প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। দিবাভাগে ত কথাই নাই, রাত্রিকালে নিদ্রার সময়েও ঐ শান্তি ও উল্লাস তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইতে না যাইতে তিনি স্বপ্নে দেখিতে

* কেহ কেহ বলেন, শ্রীযুত ক্ষুদিরাম বহুপূর্ব্বে এক সময়ে দেরেপুর হইতে তীর্থগমনপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবন, ৺অযোধ্যা এবং ৺বারাণসী দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন; এবং উহার কিছুকাল পরে তাঁহার পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে তিনি ঐ তীর্থযাত্রার কথা স্মরণ করিয়া, তাহাদিগের রামকুমার ও কাত্যায়নী নামকরণ করিয়াছিলেন। শেষবারে তিনি কেবলমাত্র ৺গযাধাম দর্শন করিয়াই বাটী ফিরিয়াছিলেন।

লাগিলেন, তিনি যেন শ্রীমন্দিরে ৺ গদাধরের শ্রীপাদপদ্মসম্মুখে পুনরায় পিতৃপুরুষসকলের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিতেছেন এবং তাঁহারা যেন দিব্য জ্যোতির্ম্ময় শরীরে উহা সানন্দে গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। বহুকাল পরে তাঁহাদিগের দর্শন লাভ করিয়া তিনি যেন আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছেন না; ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে রোদন করিতে করিতে তাঁহাদিগের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছেন! পরক্ষণেই আবার দেখিতে লাগিলেন, যেন অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিতে মন্দির পূর্ণ হইয়াছে এবং পিতৃ-পুরুষগণ সসম্ভ্রমে, সংযতভাবে দুই পার্শ্বে করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া মন্দিরমধ্যে বিচিত্র সিংহাসনে সুখাসীন এক অদ্ভুত পুরুষের উপাসনা করিতেছেন! দেখিলেন, নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম, জ্যোতিমণ্ডিত-তনু ঐ পুরুষ স্নিগ্ধপ্রসন্নদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে অবলোকনপূর্ব্বক হাস্যমুখে তাঁহাকে নিকটে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন! যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইয়া তিনি যেন তখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তিবিহ্বলচিত্তে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক হৃদয়ের আবেগে কত প্রকার স্তুতি ও বন্দনা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন ঐ দিব্য পুরুষ যেন তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া বীণানিস্যন্দী মধুর স্বরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, 'ক্ষুদিরাম, তোমার ভক্তিতে পরম প্রসন্ন হইয়াছি, পুত্ররূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া আমি তোমার সেবা গ্রহণ করিব!' স্বপ্নেরও অতীত ঐ কথা শুনিয়া তাঁহার যেন আনন্দের অবধি রহিল না, কিন্তু পরক্ষণেই চিরদরিদ্র তিনি তাঁহাকে কি খাইতে দিবেন, কোথায় রাখিবেন ইত্যাদি ভাবিয়া গভীর বিষাদে পূর্ণ হইয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন, 'না, না

প্রভু, আমার ঐরূপ সৌভাগ্যের প্রয়োজন নাই; কৃপা করিয়া আপনি যে আমাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিলেন এবং ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট; সত্য সত্য পুত্র হইলে দরিদ্র আমি আপনার কি সেবা করিতে পারিব!' ঐ অমানব পুরুষ যেন তখন তাঁহার ঐরূপ করুণ বচন শুনিয়া অধিকতর প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, 'ভয় নাই ক্ষুদিরাম, তুমি যাহা প্রদান করিবে, তাহাই আমি তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিব; আমার অভিলাষ পূরণ করিতে আপত্তি করিও না।' শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ঐ কথা শুনিয়া যেন আর কিছুই বলিতে পারিলেন না; আনন্দ, দুঃখ প্রভৃতি পরস্পর বিপরীত ভাবসমূহ তাঁহার অন্তরে যুগপৎ প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে এককালে স্তম্ভিত ও জ্ঞানশূন্য করিল। এমন সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

কামারপুকুরে প্রত্যাগমন।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে শ্রীযুত ক্ষুদিরাম কোথায় রহিয়াছেন তাহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলেন না। পূর্ব্বোক্ত স্বপ্নের বাস্তবতা তাঁহাকে এককালে অভিভূত করিয়া রাখিল। পরে ধীরে ধীরে তাঁহার যখন স্থূল জগতের জ্ঞান উপস্থিত হইল তখন শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি ঐ অদ্ভুত স্বপ্ন স্মরণ করিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন। পরিণামে তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ হৃদয় স্থিরনিশ্চয় করিল, দেবস্বপ্ন কখনও বৃথা হয় না— নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ তাঁহার গৃহে শীঘ্র জন্ম পরিগ্রহ করিবেন— বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চয় তাঁহাকে পুনরায় পুত্রমুখ অবলোকন করিতে হইবে। অনন্তর ঐ অদ্ভুত স্বপ্নের সাফল্য পরীক্ষা না করিয়া কাহারও নিকট তদ্বিবরণ প্রকাশ করিবেন না, এইরূপ সঙ্কল্প তিনি

মনে মনে স্থির করিলেন এবং কয়েক দিন পরে ৺গয়াধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সন ১২৪২ সালের বৈশাখে কামারপুকুরে উপস্থিত হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

চন্দ্রা দেবীর বিচিত্র অনুভব।

জগৎ-পাবন মহাপুরুষসকলের জন্ম পরিগ্রহ করিবার কালে তাঁহাদিগের জনক-জননীর জীবনে অসাধারণ আধ্যাত্মিক অনুভব ও দর্শনসমূহ উপস্থিত হইবার কথা পৃথিবীস্থ সকল জাতির ধর্ম্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ভগবান্ শ্রীরাম চন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ, মায়াদেবীতনয় বুদ্ধ, মেরীনন্দন ঈশা, শ্রীভগবান্ শঙ্কর, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভৃতি যে সকল মহামহিম পুরুষপ্রবর মানব-মনের ভক্তি-শ্রদ্ধাপূত পূজার্ঘ্য অদ্যাবধি প্রতিনিয়ত প্রাপ্ত হইতেছেন তাঁহাদিগের প্রত্যেকের জনক-জননীর সম্বন্ধেই ঐরূপ কথা শাস্ত্রনিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রমাণস্বরূপে নিম্ন-লিখিত কয়েকটি কথা এখানে স্মরণ করিলেই যথেষ্ট হইবে—

অবতার-পুরুষের আবির্ভাবকালে তাঁহার জনক-জননীর দিব্য অনুভবাদি সম্বন্ধে শাস্ত্র-কথা।

যজ্ঞাবশিষ্ট পাত্রাবশেষ বা চরু ভোজন করিয়া ভগবান্ শ্রীরাম-চন্দ্রপ্রমুখ ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের জননীগণের গর্ভধারণের কথা কেবলমাত্র রামায়ণপ্রসিদ্ধ নহে, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে ও পরে তাঁহারা যে, বহুবার উক্ত ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে জগৎপাতা শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর অংশসম্ভূত ও দিব্যশক্তি সম্পন্ন বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন একথাও উহাতে লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী তাঁহার গর্ভপ্রবেশকালে এবং

ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরে তাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বররূপে অনুভব করিয়াছিলেন ; তদ্ভিন্ন তাঁহার জন্মগ্রহণের পরক্ষণ হইতে প্রতিদিন তাঁহাদিগের জীবনে নানা অদ্ভুত উপলব্ধির কথা শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণসকলে লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেবের গর্ভপ্রবেশকালে শ্রীমতী মায়াদেবী দর্শন করিয়াছিলেন, জ্যোতির্ম্ময় শ্বেতহস্তীর আকার ধারণপূর্ব্বক কোন পুরুষপ্রবর যেন তাঁহার উদরে প্রবেশ করিতেছেন এবং তাঁহার সৌভাগ্যদর্শনে ইন্দ্রপ্রমুখ যাবতীয় দেবগণ যেন তাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ ঈশার জন্মগ্রহণকালে তজ্জননী শ্রীমতী মেরী অনুভব করিয়াছিলেন, নিজ স্বামী শ্রীযুত যোষেফের সহিত সঙ্গতা হইবার পূর্ব্বেই যেন তাঁহার গর্ভ উপস্থিত হইয়াছে— অননুভূতপূর্ব্ব দিব্য আবেশে আবিষ্ট ও তন্ময় হইয়াই তাঁহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীভগবান্ শঙ্করের জননী অনুভব করিয়াছিলেন দেবাদিদেব মহাদেবের দিব্যদর্শন ও বরলাভেই তাঁহার গর্ভধারণ হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জননী শ্রীমতী শচীদেবীর জীবনেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার নানা দিব্য অনুভব উপস্থিত হইবার কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপ্রমুখ গ্রন্থসকলে লিপিবদ্ধ আছে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম, ঈশ্বরের সপ্রেম উপাসনাকে মুক্তিলাভের সুগম পথ বলিয়া মানবের নিকট নির্দ্দেশ করিয়াছে ; তাহাদিগের সকলেই ঐরূপে ঐবিষয়ে একমত হওয়ায় নিরপেক্ষ বিচারকের মনে স্বতঃই প্রশ্নের উদয় হয়, উহার ভিতর বাস্তবিক কোন সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কি না, এবং মহাপুরুষগণের

জীবনেতিহাসে বর্ণিত ঐসকল আখ্যায়িকার ভিতর কতটা গ্রহণ এবং কতটাই বা ত্যাগ করা বিধেয়।

যুক্তি, অন্য পক্ষে, মানবকে ইঙ্গিত করিয়া থাকে যে, কথাটার ভিতর কিছু সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে। কারণ, বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান যথন উচ্চপ্রকৃতিসম্পন্ন পিতামাতারই উদারচরিত্রবান্ পুত্রোৎপাদনের সামর্থ্য স্বীকার করিয়া থাকে, তথন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও ঈশাদির ন্যায় মহাপুরুষগণের জনক-জননী যে, বিশেষ সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিলেন একথা গ্রহণ করিতে হয়। তৎসঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ সকল পুরুষোত্তমকে জন্মপ্রদানকালে তাঁহাদিগের মন সাধারণ মানবাপেক্ষা অনেক উচ্চ ভূমিতে অবস্থান করিয়াছিল, এবং ঐরূপে উচ্চ ভূমিতে অবস্থানের জন্যই তাঁহারা ঐ কালে অসাধারণ দর্শন ও অনুভবাদির অধিকারী হইয়াছিলেন।

ঐ শাস্ত্রকথার যুক্তিনির্দ্দেশ।

কিন্তু পুরাণেতিহাস ঐ বিষয়ক নানা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেও, এবং যুক্তি ঐকথা ঐরূপে সমর্থন করিলেও, মানবমন উহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইতে পারে না। কারণ, উহা সর্ব্বোপরি নিজ প্রত্যক্ষের উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেজন্য আত্মা, ঈশ্বর, মুক্তি, পরকাল প্রভৃতি বিষয়সকলেও অপরোক্ষানুভূতির পূর্ব্বে কথন নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারে না। ঐরূপ হইলেও কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার বুদ্ধি অসাধারণ বা অলৌকিক বলিয়াই কোন বিষয়কে ত্যাজ্য মনে করে না—কিন্তু স্বয়ং স্বাক্ষিস্বরূপ থাকিয়া স্থিরভাবে তদ্বিষয়ের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ প্রমাণসকল সংগ্রহে

সহজে বিশ্বাসগম্য না হইলেও ঐসকল কথা মিথ্যা বলিয়া ত্যাজ্য নহে।

অগ্রসর হয় এবং উপযুক্ত কালে তদ্বিষয় মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ অথবা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে।

সে যাহা হউক, যে মহাপুরুষের জীবনেতিহাস আমরা লিখিতে বসিয়াছি তাঁহার জন্মকালে তাঁহার জনক-জননীর জীবনেও যে, নানা দিব্যদর্শন ও অনুভবসমূহ উপস্থিত হইয়াছিল একথা আমরা অতি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি। সুতরাং সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ করা ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর নাই। পূর্ব্ব অধ্যায়ে শ্রীযুত ক্ষুদিরামের সম্বন্ধে ঐরূপ কয়েকটি কথা পাঠককে বলিয়াছি। বর্ত্তমান অধ্যায়ে শ্রীমতী চন্দ্রমণি সম্বন্ধে ঐরূপ সকল কথা আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

গয়া হইতে ফিরিয়া ক্ষুদিরামের চন্দ্রা দেবীর ভাবপরিবর্ত্তন দর্শন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, গয়াধামে শ্রীযুত ক্ষুদিরাম যে অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, গৃহে ফিরিয়া তাহার কথা কাহাকেও না বলিয়া তিনি নীরবে উহার ফলাফল লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ঐ বিষয় অনুসন্ধান করিতে যাইয়া শ্রীমতী চন্দ্রা দেবীর স্বভাবের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন প্রথমেই তাঁহার নয়নে পতিত হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন মানবী চন্দ্রা এখন যেন সত্য সত্যই দেবীত্ব পদবীতে আরূঢ়া হইয়াছেন। কোথা হইতে একটা সার্ব্বজনীন প্রেম আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া সংসারের বাসনাময় কোলাহল হইতে তাঁহাকে যেন অনেক উচ্চে তুলিয়া রাখিয়াছে। আপনার সংসারের চিন্তা অপেক্ষা শ্রীমতী চন্দ্রার মনে এখন অভাবগ্রস্ত প্রতিবেশীসকলের সংসারের চিন্তাই প্রবল হইয়াছে। নিজ সংসারের কর্ত্তব্য পালন করিতে

করিতে তিনি দশবার ছুটিয়া যাইয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিয়া আসেন এবং আহার্য্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুসকলের ভিতর যাহার যে বস্তুর অভাব দেখেন, আপন সংসার হইতে লুকাইয়া লইয়া যাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ঐসকল তাহাদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। আবার ৺রঘুবীরের সেবা সারিয়া স্বামী পুত্রাদিকে ভোজন করাইয়া বেলা তৃতীয় প্রহরে স্বয়ং ভোজনে বসিবার পূর্ব্বে শ্রীমতী চন্দ্রা পুনরায় তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বাটীতে যাইয়া সংবাদ লইয়া আসেন, তাহাদিগের সকলের ভোজন হইয়াছে কি না। যদি কোন দিন দেখিতে পান যে কোন কারণে কাহারও আহার জুটে নাই তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সাদরে বাটীতে আনয়নপূর্ব্বক নিজের অন্ন ধরিয়া দিয়া স্বয়ং হৃষ্টচিত্তে সামান্য জলযোগ মাত্র করিয়া দিন কাটাইয়া দেন।

চন্দ্রা দেবীর অপত্যস্নেহের প্রসার দর্শন।

শ্রীমতী চন্দ্রা প্রতিবেশী বালকবালিকাগণকে চিরকাল অপত্য-নির্ব্বিশেষে ভালবাসিতেন। ক্ষুদিরাম দেখিলেন, তাঁহার সেই অপত্যস্নেহ এখন যেন দেবতাসকলের উপরেও প্রসারিত হইয়াছে। কুলদেবতা ৺রঘুবীরকে তিনি এখন আপন পুত্রগণের অন্যতমরূপে সত্য সত্যই দর্শন করিতেছেন; এবং ৺শীতলা দেবী ও ৺রামেশ্বর বাণলিঙ্গটিও যেন তাঁহার হৃদয়ে ঐরূপ স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ সকল দেবতার সেবা ও পূজাকালে ইতিপূর্ব্বে তাঁহার অন্তর শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়ে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত; ভালবাসা আসিয়া সেই ভয়কে যেন এখন কোথায় অন্তর্হিত করিয়াছে। দেবতাগণের নিকটে তাঁহার এখন আর ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই, লুকাইবার এবং চাহিবার যেন

কিছুই নাই! আছে কেবল তৎস্থলে, আপনার হইতে আপনার বলিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞান করা, তাঁহাদিগকে সুখী করিবার জন্য সর্ব্বস্ব প্রদানের ইচ্ছা এবং তাঁহাদিগের সহিত চিরসম্বন্ধ হওয়ার অনন্ত উল্লাস।

ক্ষুদিরাম বুঝিলেন ঐরূপ নিঃসঙ্কোচ দেবভক্তি ও নির্ভরপ্রসূত উল্লাসই সরলহৃদয়া চন্দ্রাকে এখন অধিকতর উদারস্বভাবা করিয়াছে।

তদ্দর্শনে ক্ষুদিরামের চিন্তা ও সঙ্কল্প।

উহাদিগের প্রভাবেই তিনি এখন কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে বা পর ভাবিতে পারিতেছেন না। কিন্তু স্বার্থপর পৃথিবীর লোক তাঁহার এই অপূর্ব্ব উদারতার কথা কি কখনও যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিবে?—কখনই না। তাঁহাকে অল্পবুদ্ধি বা 'পাগল' বলিবে; অথবা কঠোরতর ভাষায় তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিবে। ঐরূপ ভাবিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন।

ঐরূপ অবসর আসিতে বিলম্বও হইল না। সরলপ্রাণা চন্দ্রা স্বামীর নিকটে নিজ চিন্তাটি পর্য্যন্ত কখনও গোপন করিতে

চন্দ্রা দেবীর দেব-স্বপ্ন।

পারিতেন না। বয়স্যাদিগের নিকটেই তিনি অনেক সময় মনের সকল কথা বলিয়া ফেলিতেন, তা পৃথিবীর সকলের অপেক্ষা যাঁহার সহিত তাঁহার নিকট-সম্বন্ধ ঈশ্বর স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার নিকট ঐ সকল গোপন করিবেন কিরূপে? অতএব ৺গয়াদর্শন করিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম বাটী ফিরিলেই কয়েক দিন ধরিয়া চন্দ্রা দেবী তাঁহাকে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, দেখিয়া-

ছিলেন অথবা অনুভব করিয়াছিলেন সেই সমস্ত কথা সুবিধা পাইলেই যখন তখন বলিতে লাগিলেন। ঐরূপ অবসরে একদিন বলিলেন, "দেখ, তুমি যখন ৺গয়া গিয়াছিলে তখন একদিন রাত্রিকালে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম, যেন এক জ্যোতির্ম্ময় দেবতা আমার শয্যাধিকার করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম তুমি, কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম, কোন মানবের ঐরূপ রূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। সে যাহা হউক ঐরূপ দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখনও মনে হইতে লাগিল তিনি যেন শয্যায় রহিয়াছেন। পরক্ষণে মনে হইল মানুষের নিকট দেবতা আবার কোন্ কালে ঐরূপে আসিয়া থাকেন? তখন মনে হইল তবে বুঝি কোন দুষ্ট লোক কোন মন্দ অভিসন্ধিতে ঘরে ঢুকিয়াছে এবং তাহার পদশব্দাদির জন্য আমি ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। ঐকথা মনে হইয়াই বিষম ভয় হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিলাম; দেখিলাম, কেহ কোথাও নাই, গৃহদ্বার যেমন অর্গলবদ্ধ তেমনি রহিয়াছে। তত্রাচ ভয়ে সে রাত্রে আর নিদ্রা যাইতে পারিলাম না। ভাবিলাম, কে হয়ত কৌশলে অর্গল খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল এবং আমাকে জাগরিতা হইতে দেখিয়াই পলাইয়া পুনরায় কৌশলে অর্গল বদ্ধ করিয়া গিয়াছে। প্রভাত হইতে না হইতে ধনী কামারণী ও ধর্ম্মদাস লাহার ভগ্নী প্রসন্নকে ডাকাইলাম এবং তাহাদিগকে সকল কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমরা কি বুঝ বল দেখি, সত্য সত্যই কি লোক আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল? আমার সহিত পল্লীর কাহারও বিরোধ নাই— কেবল মধু যুগীর সহিত সেদিন সামান্য কথা লইয়া কিছু বচসা

হইয়াছিল—সেই কি আড়ি করিয়া ঐরূপে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল?'—তখন তাহারা দুইজনে হাসিতে হাসিতে আমাকে অনেক তিরস্কার করিল। বলিল, 'মর্ মাগি, বুড়ো হয়ে তুই কি পাগল হলি নাকি, যে স্বপ্ন দেখে এইরূপে চলাচ্ছিস্! অপর লোকে একথা শুন্‌লে বল্‌বে কি বল্ দেখি? তোর নামে একেবারে অপবাদ রটিয়ে দেবে। ফের যদি ওকথা কাউকে বল্‌বি ত মজা দেখ্‌তে পাবি।' তাহারা ঐরূপ বলাতে ভাবিলাম, তবে স্বপ্নই দেখিয়াছিলাম। আর ভাবিলাম, একথা আর কাহাকেও বলিব না, কিন্তু তুমি ফিরিয়া আসিলে তোমাকে বলিব।"

শিবমন্দিরে চন্দ্রা দেবীর দিব্যদর্শন ও অনুভব।

"আর একদিন, যুগীদের শিব-মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধনীর সহিত কথা কহিতেছি, এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম, ৺মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ হইতে দিব্যজ্যোতিঃ নির্গত হইয়া মন্দির পূর্ণ করিয়াছে এবং বায়ুর ন্যায় তরঙ্গাকারে উহা আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে! আশ্চর্য্য হইয়া ধনীকে ঐ কথা বলিতে যাইতেছি, এমন সময়ে সহসা উহা নিকটে আসিয়া আমাকে যেন ছাইয়া ফেলিল এবং আমার ভিতরে প্রবল বেগে প্রবেশ করিতে লাগিল। ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিতা হইয়া এককালে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলাম। পরে, ধনীর শুশ্রূষায় চৈতন্য হইলে তাহাকে সকল কথা বলিলাম। সে শুনিয়া প্রথমে অবাক্ হইল, পরে বলিল, 'তোমার বায়ুরোগ হইয়াছে।' আমার কিন্তু তদবধি মনে হইতেছে ঐ জ্যোতিঃ যেন আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং আমার যেন গর্ভসঞ্চারের উপক্রম হইয়াছে। ঐ কথাও ধনী এবং প্রসন্নকে বলিয়াছিলাম।

তাহারা শুনিয়া আমাকে 'নির্ব্বোধ,' 'পাগল' ইত্যাদি কত কি বলিয়া তিরস্কার করিল; এবং মনের ভ্রম হইতে অথবা বায়ুগুল্ম নামক ব্যাধি হইতে ঐরূপ অনুভব হইতেছে, এইরূপ নানা কথা বুঝাইয়া ঐ অনুভবের কথা কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিল। তোমাকে ভিন্ন ঐ কথা আর কাহাকেও বলিব না নিশ্চয় করিয়া তদবধি এতদিন চুপ করিয়া আছি। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়? ঐরূপ দর্শন কি আমার দেবতার কৃপায় হইয়াছে, অথবা বায়ুরোগে হইয়াছে? এখনও কিন্তু আমার মনে হয়, আমার যেন গর্ভসঞ্চার হইয়াছে।"

ঐ সকল কথা কাহাকেও না বলিতে চন্দ্রা দেবীকে ক্ষুদিরামেব সতর্ক করা।

শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ৺গয়ায় নিজ স্বপ্নের কথা স্মরণ করিতে করিতে শ্রীমতী চন্দ্রার সকল কথা শুনিলেন এবং উহা রোগ জনিত নাও হইতে পারে, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, 'এখন হইতে ঐরূপ দর্শন ও অনুভবের কথা আমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বলিও না; শ্রীশ্রীরঘুবীর কৃপা করিয়া যাহাই দেখান তাহা কল্যাণের জন্য এই কথা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে; গয়াধামে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীগদাধর আমাকেও অলৌকিক উপায়ে জানাইয়াছেন, আমাদিগকে পুনরায় পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে হইবে। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী দেবপ্রতিম স্বামীর ঐরূপ কথা শুনিয়া আশ্বস্তা হইলেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া এখন হইতে পূর্ণভাবে শ্রীশ্রীরঘুবীরের মুখাপেক্ষিণী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন আসিয়া, ব্রাহ্মণদম্পতির পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনের পরে,

ক্রমে তিন চারি মাস অতীত হইল। তখন সকলে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিল, পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে ক্ষুদিরামগৃহিণী শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী সত্য সত্যই পুনরায় অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছেন। গর্ভধারণ করিবার কালে রমণীর রূপলাবণ্য সর্ব্বত্র বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। চন্দ্রা দেবীরও তাহাই হইয়াছিল। ধনীপ্রমুখ তাঁহার প্রতিবেশিনীগণ বলিত এইবার গর্ভধারণ করিয়া তিনি যেন অন্যান্য বার অপেক্ষা অধিক রূপ-লাবণ্যশালিনী হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার উহা দেখিয়া জল্পনা করিত, 'বুড়ো বয়সে গর্ভবতী হইয়া মাগীর এত রূপ!—বোধ হয় ব্রাহ্মণী এবার প্রসবকালে মৃত্যুমুখে পতিতা হইবে'।"

সে যাহা হউক, গর্ভবতী হইয়া শ্রীমতী চন্দ্রার দিব্যদর্শন ও অনুভবসকল দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়াছিল। শুনা যায়, এই সময়ে তিনি প্রায় নিত্যই দেবদেবীসকলের দর্শন লাভ করিতেন; কখন বা অনুভব করিতেন, তাঁহাদিগের শ্রীঅঙ্গনিঃসৃত পুণ্যগন্ধে গৃহ পূর্ণ হইয়াছে; কখন বা দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বিস্মিতা হইতেন। আবার শুনা যায়, সকল দেব-দেবীর উপরেই তাঁহার মাতৃস্নেহ যেন এইকালে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। শুনা যায় এইকালে তিনি প্রায় প্রতিদিন ঐ সকল দর্শন ও অনুভবের কথা নিজ স্বামীর নিকটে বলিয়া কেন তাঁহার ঐরূপ হইতেছে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম তাহাতে তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া ঐ সকলের জন্য শঙ্কিতা হইতে নিষেধ করিতেন। ঐ কালের এক দিনের ঘটনা, আমরা যেরূপ

চন্দ্রা দেবীর পুনরায় গর্ভ-ধারণ ও ঐ কালে তাঁহার দিব্য দর্শন-সমূহ।

শুনিয়াছি, এখানে বিবৃত করিতেছি। শ্রীমতী চন্দ্রা তাঁহার স্বামীর নিকটে সেদিন ভয়চকিতা হইয়া এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলেন,—"দেব, শিবমন্দিরের সম্মুখে জ্যোতিদর্শনের দিন হইতে মধ্যে মধ্যে কত যে দেব-দেবীর দর্শন পাইয়া থাকি তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহাদিগের অনেকের মূর্ত্তি আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও ছবিতেও দেখি নাই। আজ দেখি হাঁসের উপর চড়িয়া একজন আসিয়া উপস্থিত। দেখিয়া ভয় হইল; আবার রৌদ্রের তাপে তাহার মুখখানি রক্তবর্ণ হইয়াছে দেখিয়া মন কেমন করিতে লাগিল। তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, 'ওরে বাপ্ হাঁসে চড়া ঠাকুর, রৌদ্রে তোর মুখখানি যে শুকাইয়া গিয়াছে; ঘরে আমানি পান্তা আছে, দুটি খাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া যা'। সে ঐ কথা শুনিয়া হাসিয়া যেন হাওয়ায় মিলাইয়া গেল! আর দেখিতে পাইলাম না! ঐরূপ কত মূর্ত্তি দেখি। পূজা বা ধ্যান করিয়া নহে—সহজ অবস্থায়, যখন তখন দেখিয়া থাকি। কখন কখন আবার দেখিতে পাই তাহারা যেন মানুষের মত হইয়া সম্মুখে আসিতে আসিতে বায়ুতে মিলাইয়া গেল! কেন ঐরূপ সব দেখিতে পাই বল দেখি? আমার কি কোন রোগ হইল? সময়ে সময়ে ভাবি আমাকে গোঁসাইয়ে * পাইল না কি?" শ্রীযুত ক্ষুদিরাম তখন তাঁহাকে

* শ্রীযুত সুখলাল গোস্বামীর মৃত্যুর পরে নানা দৈব উৎপাত উপস্থিত হওয়ায় পল্লীবাসিগণের মনে ধারণা হইয়াছিল যে উক্ত গোস্বামী বা তদ্বংশীয় কোন ব্যক্তি মরিয়া প্রেত হইয়া গোস্বামীদিগের বাটীর সম্মুখে যে বৃহৎ বকুল গাছ ছিল তাহাতে অবস্থান করিতেন। ঐ বিশ্বাসপ্রভাবেই লোকে ঐ সময়ে কাহারও কোনরূপ দিব্যদর্শন উপস্থিত হইলে বলিত, 'উহাকে গোঁসাইয়ে পাইয়াছে।' সরলহৃদয়া চন্দ্রা দেবী সেজন্যই এই সময়ে ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

চন্দ্রা দেবীর বিচিত্র অনুভব।

গয়ায় দৃষ্ট নিজ স্বপ্নের কথা বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে, অশেষ সৌভাগ্যের ফলে তিনি এবার পুরুষোত্তমকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার পুণ্যসংস্পর্শেই তাঁহার ঐরূপ দিব্য দর্শনসমূহ উপস্থিত হইতেছে। স্বামীর উপর অসীম বিশ্বাসশালিনী চন্দ্রার হৃদয় তাঁহার ঐ সকল কথা শুনিয়া দিব্য ভক্তিতে পূর্ণ হইল এবং নবীন বলে বলশালিনী হইয়া তিনি নিশ্চিন্তা হইলেন।

ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ও তাঁহার পূতস্বভাবা গৃহিণী শ্রীশ্রীরঘুবীরের একান্ত শরণাগত থাকিয়া যাঁহার শুভাগমনে তাঁহাদিগের জীবন ঐশী ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে সেই মহাপুরুষ-পুত্রের মুখ নিরীক্ষণের আশায় কাল কাটাইতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহাপুরুষের জন্মকথা।

শরৎ, হেমন্ত ও শীত অতীত হইয়া ক্রমে ঋতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হইল। শীত ও গ্রীষ্মের সুখসম্মিলনে মধুময় ফাল্গুন স্থাবরজঙ্গমের ভিতর নবীন প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া আজ ষষ্ঠ দিবস সংসারে সমাগত। জীবজগতে একটা বিশেষ উৎসাহ, আনন্দ ও প্রেমের প্রেরণা সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। শাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মানন্দের এক কণা পদার্থ সকলের মধ্যে নিহিত থাকিয়া তাহাদিগকে সরস করিয়া রাখিয়াছে—ঐ দিব্যোজ্জ্বল আনন্দকণার কিঞ্চিদধিক মাত্রা পাইয়াই কি এই কাল সংসারের সর্ব্বত্র এত উল্লাস আনয়ন করিয়া থাকে?

চন্দ্রা দেবীর আশঙ্কা ও স্বামীর কথায় আশ্বাস প্রাপ্তি।

৺ রঘুবীরের ভোগ রাঁধিতে রাঁধিতে আসন্নপ্রসবা শ্রীমতী চন্দ্রা প্রাণে আজ দিব্য উল্লাস অনুভব করিতেছিলেন; কিন্তু শরীর নিতান্ত অবসন্ন জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সহসা তাহার মনে হইল, শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে কখন কি হয়; এখনই যদি প্রসবকাল উপস্থিত হয় তাহা হইলে গৃহে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই যে অদ্যকার ঠাকুরসেবা চালাইয়া লইবে। তাহা হইলে উপায়? ভীতা হইয়া তিনি ঐ কথা স্বামীকে নিবেদন করিলেন। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম তাহাতে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "ভয় নাই, তোমার গর্ভে যিনি শুভাগমন করিয়াছেন তিনি ৺রঘুবীরের

পূজাসেবায় বিঘ্নোৎপাদন করিয়া কখনই সংসারে প্রবেশ করিবেন না—ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস; অতএব নিশ্চিন্তা হও, অদ্যকার মত ঠাকুরসেবা তুমি নিশ্চয় চালাইতে পারিবে; কল্য হইতে আমি উহার জন্য ভিন্ন বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি; এবং ধনীকেও বলা হইয়াছে যাহাতে সে অদ্য হইতে রাত্রে এখানেই শয়ন করিয়া থাকে।" শ্রীমতী চন্দ্রা স্বামীর ঐরূপ কথায় দেহে নবীন বলসঞ্চার অনুভব করিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে পুনরায় গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা হইলেন। ঘটনাও ঐরূপ হইল—৺রঘুবীরের মধ্যাহ্ন ভোগ এবং সান্ধ্যশীতলাদি কর্ম্ম পর্য্যন্ত সেদিন নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়া গেল। রাত্রে আহারাদি সমাপন করিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ও রামকুমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং ধনী আসিয়া চন্দ্রা দেবীর সহিত এক কক্ষে শয়ন করিয়া রহিল। ৺রঘুবীরের ঘর ভিন্ন, বাটীতে বসবাসের জন্য দুইখানি চালা ঘর ও একখানি রন্ধনশালা মাত্র ছিল, এবং অপর একখানি ক্ষুদ্র চালা ঘরে এক পার্শ্বে ধান্য কুটিবার জন্য একটি ঢেঁকি এবং উহা সিদ্ধ করিবার জন্য একটি উনান বিদ্যমান ছিল। স্থানাভাবে শেষোক্ত চালাখানিই শ্রীমতী চন্দ্রার সূতিকাগৃহরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিল।

রাত্রি অবসান হইতে প্রায় অর্দ্ধদণ্ড অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে চন্দ্রা দেবীর প্রসবপীড়া উপস্থিত হইল। ধনীর সাহায্যে তিনি পূর্ব্বোক্ত ঢেঁকিশালে গিয়া শয়ন করিলেন এবং অবিলম্বে এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। শ্রীমতী চন্দ্রার জন্য ধনী তখন তৎকালোপযোগী ব্যবস্থা করিয়া জাতককে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া দেখিল, ইতিপূর্ব্বে তাহাকে যেখানে রক্ষা করিয়াছিল সেই স্থান হইতে সে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে!

গদাধরের জন্ম।

ভয়ত্রস্তা হইয়া ধনী প্রদীপ উজ্জ্বল করিল এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইল, রক্তক্লেদময় পিচ্ছিল ভূমিতে ধীরে ধীরে হড়কাইয়া ধান্য সিদ্ধ করিবার চুল্লীর ভিতর প্রবেশপূর্ব্বক সে বিভূতি-ভূষিতাঙ্গ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, অথচ কোন শব্দ করে নাই! ধনী তখন তাহাকে যত্নে উঠাইয়া লইল এবং পরিষ্কৃত করিয়া দীপালোকে ধরিয়া দেখিল, অদ্ভুত প্রিয়দর্শন বালক, 'যেন ছয় মাসের ছেলের মত বড়!' প্রতিবেশী লাহাবাবুদের বাটী হইতে তখন প্রসন্নপ্রমুখ চন্দ্রা দেবীর দুই চারিজন বয়স্য সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছে—ধনী তাহাদিগের নিকটে ঐ সংবাদ ঘোষণা করিল, এবং পূতগম্ভীর ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীযুত ক্ষুদিরামের তপস্বী দরিদ্র কুটীর শুভ শঙ্খারাবে পূর্ণ হইয়া মহাপুরুষের শুভাগমন-বার্ত্তা সংসারে প্রচার করিল।

অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ ক্ষুদিরাম নবাগত বালকের জন্মলগ্ন নিরূপণ করিতে যাইয়া দেখিলেন, জাতক বিশেষ শুভক্ষণে সংসারে প্রবেশ করিয়াছে। দেখিলেন—

গদাধরের শুভ জন্মমুহূর্ত্ত সম্বন্ধে জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা।

ঐ দিন সন ১২৪২ সালের অথবা ১৭৫৭ শকাব্দার ৬ই ফাল্গুন, ইংরাজী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী, শুক্লপক্ষ, বুধবার। রাত্রি একত্রিশ দণ্ড অতীত হইয়া অর্দ্ধদণ্ড-মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শুভা দ্বিতীয়া তিথি ঐ সময়ে পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের সহিত সংযুক্তা হইয়া সংসারে সিদ্ধিযোগ আনয়ন করিয়াছিল। বালকের জন্মলগ্নে রবি, চন্দ্র ও বুধ একত্র মিলিত রহিয়াছে এবং শুক্র, মঙ্গল ও শনি তুঙ্গস্থান অধিকারপূর্ব্বক তাহার অসাধারণ

জীবনের পরিচায়ক হইয়া রহিয়াছে। আবার মহামুনি পরাশরের মত অবলম্বনপূর্ব্বক দেখিলে রাহু এবং কেতু গ্রহদ্বয়কে তাঁহার জন্মকালে তুঙ্গস্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তদুপরি, বৃহস্পতি তুঙ্গাভিলাষীরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া বালকের অদৃষ্টের উপর বিশেষ শুভ-প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

গদাধরের বাশ্যাশ্রিত নাম।

অতঃপর বিশিষ্ট জ্যোতির্ব্বিদগণ, নবজাত বালকের জন্মক্ষণ পরীক্ষাপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, জাতক যেরূপ উচ্চলগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তৎসম্বন্ধে জ্যোতিষ-শাস্ত্র নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করে যে, "ঐরূপ ব্যক্তি ধর্ম্মবিৎ ও মাননীয় হইবেন এবং সর্ব্বদা পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত থাকিবেন। বহুশিষ্যপরিবৃত হইয়া ঐ ব্যক্তি দেবমন্দিরে বাস করিবেন; এবং নবীন ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়া নারায়ণাংশসম্ভুত মহাপুরুষ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভপূর্ব্বক সর্ব্বত্র সকল লোকের পূজ্য হইবেন।"* শ্রীযুত ক্ষুদিরামের মন উহাতে বিস্ময়পূর্ণ হইল।

---

* ধর্ম্মস্থানাধিপে তুঙ্গে ধর্ম্মস্থে তুঙ্গখেচরে।
গুরুণা দৃষ্টিসংযোগে লগ্নেশে ধর্ম্মসংস্থিতে।
কেন্দ্রস্থানগতে সৌম্যে গুরৌ চৈব তু কোণভে।
স্থিরলগ্নে যদা জন্ম সম্প্রদায়প্রভুঃ হি সঃ॥
ধর্ম্মবিন্মাননীয়স্তু পুণ্যকর্ম্মরতঃ সদা।
দেবমন্দিরবাসী চ বহুশিষ্যসমন্বিতঃ।
মহাপুরুষসংজ্ঞোঽয়ং নারায়ণাংশসম্ভবঃ।
সর্ব্বত্র জনপূজ্যশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়।
ইতি ভৃগুসংহিতায়াং সম্প্রদায়প্রভুয়োগঃ তৎফলঞ্চ।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতিভূ'ষণ-কৃত ঠাকুরের জন্মকোষ্ঠী হইতে উক্ত বচন উদ্ধৃত হইল।

তিনি কৃতজ্ঞহৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন, ৺গয়াধামে তিনি যে দেবস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছিলেন তাহা সত্য সত্যই পূর্ণ হইল! অনন্তর জাতকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক বালকের রাশ্যাশ্রিত নাম শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র স্থির করিলেন এবং গয়াধামে অবস্থানকালে নিজ বিচিত্র স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া তাহাকে সর্ব্বজনসমক্ষে শ্রীযুত গদাধর নামে অভিহিত করিতে মনস্থ করিলেন।

গদাধরের জন্মকুণ্ডলী।

পাঠকের সৌকর্য্যার্থ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিচিত্র জন্মকুণ্ডলীর * সহিত তাঁহার কোষ্ঠীর কিয়দংশ নিম্নে প্রদান করিতেছি। জ্যোতিষশাস্ত্রাভিজ্ঞ পাঠক তদ্দৃষ্টে বুঝিতে পারিবেন, উহা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশঙ্কর ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদির অবতারপ্রথিত পুরুষসকলের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

---

* ঠাকুরের জন্মকাল সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আমরা এথানে পাঠককে বলা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিবার কালে আমরা অনেকে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছিলাম, তাঁহার "যথার্থ জন্মপত্রিকা হারাইয়া গিয়াছে এবং উহার স্থলে বহুকাল পরে যে জন্মপত্রিকা করান হইয়াছে তাহা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ।" তাঁহার নিকটে আমরা এ কথাও বহুবার শুনিয়াছি যে, তাঁহার জন্ম "ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে হইয়াছিল, ঐ দিন বুধবার ছিল," তাঁহার কুম্ভরাশি এবং তাঁহার "জন্মলগ্নে রবি চন্দ্র ও বুধ ছিল।" "লীলাপ্রসঙ্গ" লিখিবার কালে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর যথাযথ সাল তারিখ নির্ণয়ে অগ্রসর হইয়া আমরা শেষোক্ত জন্মপত্রিকাখানি আনাইয়া দেখি, উহাতে তাহার জন্মকাল সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে—"শক ১৭৫৬।১০।৯।৫৯।১২ ফাল্গুনস্য দশমদিবসে বুধবাসরে গৌরপক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে" তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ঐ সালের পঞ্জিকা আনাইয়া দেখা গেল উক্ত কোষ্ঠীতে উল্লিখিত সালের ঐ দিবসে কৃষ্ণপক্ষ নবমী তিথি এবং শুক্রবার হয়। সুতরাং উক্ত জন্মপত্রিকাখানিকে ঠাকুর কেন ভ্রমপূর্ণ বলিতেন তাহা বুঝিতে পারিয়া উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক

মহাপুরুষের জন্মকথা।

"শুভমস্তু। শক-নরপতেরতীতাব্দাদয়ঃ ১৭৫৭।১০।৫।৫৯।২৮।২৯, সন ১২৪২ সাল, ৬ই ফাল্গুন, বুধবার, রাত্রি অবসানে (অর্দ্ধদণ্ড রাত্রি থাকিতে) কুম্ভলগ্নে প্রথম নবাংশে জন্ম॥ কুম্ভরাশি, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের প্রথম পাদে জন্ম॥ রাত্রিজাত দণ্ডাদিঃ ৩১।০।১৪, সূর্য্যোদয়াদিষ্ট-দণ্ডাদিঃ ৫৯।২৮।২৯, অক্ষাংশ ২২।৩৪, পলভা ৫।১।৫।১০॥

রা ৩ বক্রী বৃ৬		শু ২৬ র২৪ চ২৫ বক্রী অঃ বু২৪	লং ৩।১৯' হোরা লং ০।৪৬'
		অ মং ২২	
	বক্রী শ ১৫	কে ১৭	

দিবা—২৮।২৮।১৫			দিবা—২৮।৩১		
৪	২৪	২০	৫	২৫	২১
১	৫১	৪৯	২	৫১	৪১
৪৬	২৬	৫৯	৪৫	৪১	৪৮
৪৪	কিং	৬	১৬	২	৭
জাতাহঃ			পরাহঃ		

পুরাতন পঞ্জিকাসকলে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কোন্ শকের ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় বুধবার এবং রবি, চন্দ্র ও বুধ কুম্ভ রাশিতে একত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

চান্দ্রফাল্গুনস্য শুক্লপক্ষীয়-দ্বিতীয়া জন্মতিথি।

পূর্ব্বভাদ্রপদ-নক্ষত্র-মানং ৬০।১৫।০

তস্য ভোগদণ্ডাদিঃ ৫২।১২।৩১

ভুক্ত-দণ্ডাদিঃ ৮।২।২৯

(শকাব্দা ১৭৫৭), এতচ্ছকীয়-সৌর-ফাল্গুনস্য ষষ্ঠ-দিবসে, বুধবাসরে, শুক্ল-পক্ষীয়-দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ, পূর্ব্বভাদ্রপদ-নক্ষত্রস্য

মিলিত হইয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে ঐরূপ দুইটি দিন পাওয়া গেল; একটি ১৭৫৪ শকে এবং দ্বিতীয়টি ১৭৫৭ শকে। তন্মধ্যে প্রথমটিকে আমবা ত্যাগ কবিলাম। কাবণ, ১৭৫৪ শক ঠাকুবেব জন্মকাল বলিয়া নির্ণয় করিলে, তাঁহার মুখে তাঁহার বয়স সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তদপেক্ষা ৩ বৎসর ২ মাস বাড়াইয়া তাঁহার আয়ু গণনা করিতে হয়। পক্ষান্তরে ১৭৫৭ শককে তাঁহার জন্মকাল বলিয়া নির্ণয় করিলে তাঁহাব জীবৎকালে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তগণ তাঁহাব যে জন্মোৎসব করিতেন তৎকালে তিনি নিজ বয়স সম্বন্ধে যেরূপ নির্ণয কবিতেন তাহা বৃদ্ধি করিযা পরমায়ু গণনা করিতে হয় না। শুদ্ধ তাহাই নহে, আমবা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি ঠাকুরেব বিবাহকালে তাঁহার বযস ২৪ বৎসব এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীব বয়স ৫ বৎসর মাত্র ছিল—ঐ বিষয়েও কোন ব্যতিক্রম করিতে হয় না। তদ্ভিন্ন, ঠাকুব দেহরক্ষা করিলে সমবেত ভক্তগণ কাশীপুর শ্মশানের মৃত্যু-নির্ণায়ক (রেজেষ্টারি) পুস্তকে তাঁহার বয়স ৫১ বৎসব লিখাইয়া দিয়াছিলেন—তাহারও কোনরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয না। ঐ সকল কারণে আমরা ১৭৫৭ শককেই ঠাকুরের জন্মকাল বলিযা অবধারিত করিলাম।

ঐরূপ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই নাই, কিন্তু কলিকাতা, বহুবাজার, ২ নম্বর লালবিহারী ঠাকুরের লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ ভট্টাচার্য্যের নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারের অসাধারণ ক্ষমতার কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাব নিকটে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর জন্মকুণ্ডলী প্রেরণ করি এবং তদ্দৃষ্টে গণনা করিয়া ঠাকরের জন্মকুণ্ডলী নির্ণয় করিয়া দিতে অনুরোধ করি। তিনিও ঐ বিষয় গণনা পূর্ব্বক ১৭৫৭ শককেই ঠাকুরের জন্মকাল বলিয়া স্থির করেন।

ঐরূপে ১৭৫৭ শকে বা সন ১২৪২ সালেই ঠাকুরের জন্ম হইয়াছিল এ কথায় দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আমরা শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নাবায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ

মহাপুরুষের জন্মকথা।

প্রথমচরণে, সিদ্ধিযোগে, বালবকরণে, এবং পঞ্চাঙ্গ-সংশুদ্ধৌ, রাত্রি চতুর্দ্দশবিপলাধিকৈক-ত্রিংশদ্দণ্ড-সময়ে, অয়নাংশোদ্ভব-শুভ-কুম্ভলগ্নে (লগ্নাস্ফুট-রাশ্যাদিঃ ১০।৩।১৯´।৫৩´´।২০´´´), শনৈশ্চরস্য ক্ষেত্রে, সূর্য্যাস্য হোরায়াং, সূর্য্যসুতস্য দ্রেক্কাণে, শুক্রস্য নবাংশে, বৃহস্পতের্দ্বাদশাংশে, কুজস্য ত্রিংশাংশে, এবং ষড়্বর্গ-পরিশোধিতে, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রাশ্রিত-কুম্ভরাশিস্থিতে চন্দ্রে, বুধস্য যামার্দ্ধে, জীবস্য দণ্ডে, কোণস্থে গুরৌ, কেন্দ্রস্থে বুধে চন্দ্রে চ, লগ্নস্থে চন্দ্রে, ত্রিগ্রহযোগে, ধর্ম্মকর্ম্মাধিপয়োঃ

গদাধরের জন্ম-পত্রিকার কিয়দংশ।

মহাশয়কে তদনুসারে ঠাকুরের জন্মকোষ্ঠী গণনা করিয়া দিতে অনুরোধ করি এবং তিনি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উহা সম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন।

ঠাকুরের ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জন্মের কথা আমরা কেবলমাত্র কোষ্ঠীগণনায় স্থির করি নাই ; কিন্তু ঠাকুরের পরিবারবর্গের মুখে শ্রুত নিম্নলিখিত ঘটনা হইতেও নির্ণয় করিয়াছি। তাঁহারা বলেন ঠাকুর জন্মগ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরে হড়কাইয়া সূতিকাগৃহে অবস্থিত ধান্য সিদ্ধ করিবার চুল্লীর ভিতর পড়িয়া ভস্মাচ্ছাদিত হইয়াছিলেন। সদ্যোজাত শিশুর যে ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহা অন্ধকারে বুঝিতে পারা যায় নাই। পরে আলোক আনিয়া অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে উক্ত চুল্লীর ভিতর হইতে বাহির করা হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, ১৭৫৭ শকের ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয়ায় ঠাকুরের জন্ম যেরূপ অদ্ভুত লগ্নে হইয়াছিল তাহা শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণকৃত তাঁহার কোষ্ঠী দেখিয়া সম্যক উপলব্ধি হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের অলৌকিক জীবন-ঘটনাসমূহ কোষ্ঠীর সহিত মিলাইয়া দেখিয়া ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতের জ্যোতিষ শাস্ত্র যথার্থই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, ঠাকুরের ভ্রমপূর্ণ পুরাতন কোষ্ঠী, শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ-কৃত তাঁহার বিশুদ্ধ কোষ্ঠী এবং শ্রীযুক্ত শশীভূষণ ভট্টাচার্য্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মকুণ্ডলী দর্শনে গণনা পূর্ব্বক ঠাকুরের যে জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়া দেন, সে সমস্ত বেলুড় মঠে সযত্নে রক্ষিত আছে।

শুক্রভৌময়োঃ তুঙ্গস্থিতয়োঃ, বর্গোত্তমস্থে লগ্নাধিপে, শনৌ চ তুঙ্গে, পরাশর-মতেন তু রাহুকেত্বোস্তুঙ্গস্থয়োঃ (যতঃ উক্তং, "রাহোস্তু বৃশভং কেতোর্বৃশ্চিকং তুঙ্গসংজ্ঞিতম্" ইত্যাদিপ্রমাণাৎ), অতএব উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে, অসাধারণ-পুণ্যভাগ্যযোগে, শুক্লপক্ষে নিশিজন্মহেতোঃ বিংশোত্তরী-দশাধিকারে জন্ম, এতেন বৃহস্পতের্দ্দশায়াং, তথা দেশভেদেন দশাধিকারনিয়মাচ্চ অষ্টোত্তরীয়-রাহোর্দশায়াং, অশেষ-গুণালঙ্কৃত-স্বধর্ম্মনিষ্ঠ-ক্ষুদিরামচট্টোপাধ্যায়-মহোদয়স্য (সহধর্ম্মিণী-দয়াবতী-চন্দ্রমণি-দেবী-মহোদয়ায়ঃ গর্ভে) শুভঃ তৃতীয়পুত্রঃ সমজনি। তস্য রাশ্যাশ্রিতং নাম শম্ভুরাম-দেবশর্ম্মা। প্রসিদ্ধ-নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়ঃ। সাধনাসিদ্ধিপ্রাপ্ত-জগদ্বিখ্যাত-নাম শ্রীরামকৃষ্ণ-পরম-হংসদেব-মহোদয়।" *

অনন্তর প্রিয়দর্শন পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ এবং তাহার অসাধারণ ভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ও শ্রীমতী চন্দ্রমণি আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিলেন এবং যথাকালে তাহার নিষ্ক্রামণ ও নামকরণাদি সম্পন্ন করিয়া অশেষ যত্নের সহিত তাহার লালনপালনে মনোনিবেশ করিলেন।

---

* শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণকৃত ঠাকুরের জন্মকোষ্ঠী হইতে পূর্ব্বোক্তাংশ উদ্ধৃত হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বাল্যকথা ও পিতৃবিয়োগ।

শাস্ত্রে আছে, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-পুরুষসকলের জনক-জননী, তাঁহাদিগের জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ও পরে নানারূপ দিব্যদর্শন লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে দেবরক্ষিত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেও পরক্ষণেই অপত্যস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ কথা ভুলিয়া যাইতেন এবং তাঁহাদিগের পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিতেন। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ও তদীয় গৃহিণী শ্রীমতী চন্দ্রা দেবীর সম্বন্ধেও ঐ কথা বলিতে পারা যায়। কারণ, তাঁহারাও প্রিয়দর্শন বালকের মুখকমল দেখিয়া গয়াক্ষেত্রের দেবস্বপ্ন, শিবমন্দিরের দিব্যদর্শন প্রভৃতির কথা এখন অনেকাংশে ভুলিয়া যাইলেন এবং তাহার যথাযথ পালন ও রক্ষণের জন্য চিন্তিত হইয়া নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। উপার্জ্জনক্ষম ভাগিনেয় শ্রীযুত রামচাঁদের নিকটে, মেদিনীপুরে পুত্রের জন্মসংবাদ প্রেরিত হইল। মাতুলের দরিদ্র সংসারে দুগ্ধের অভাব হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি একটি দুগ্ধবতী গাভী প্রেরণ করিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরামের ঐ চিন্তা নিবারণ করিলেন। ঐরূপে নবজাত শিশুর জন্য যখন যে বস্তুর প্রয়োজন হইতে লাগিল, তখনই তাহা নানাদিক হইতে অভাবনীয়

রামচাঁদের গাভীদান।

উপায়ে পূর্ণ হইলেও শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রা দেবীর চিন্তার বিরাম হইল না। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল।

গদাধরের মোহিনী শক্তি।

এদিকে নবজাত বালকের চিত্তাকর্ষণ-শক্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া জনক-জননীর উপরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, কিন্তু পরিবারস্থ সকলেরই এবং পল্লী-বাসিনী রমণীগণের উপরেও নিজ আধিপত্য ধীরে ধীরে স্থাপন করিয়া বসিল। পল্লীরমণীগণ অবসর-কালে শ্রীমতী চন্দ্রাকে এখন নিত্য দেখিতে আসিতেন এবং কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন 'তোমার পুত্রটিকে নিত্য দেখিতে ইচ্ছা করে, তা কি করি বল নিত্যই আসিতে হয়!' নিকটবর্ত্তী গ্রামসকল হইতে আত্মীয়া রমণীগণও ঐ কারণে শ্রীযুত ক্ষুদিরামের দরিদ্র কুটীরে এখন হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন। এইরূপে সকলের আদরযত্নে সুখপালিত হইয়া নবাগত শিশু ক্রমে পঞ্চমাস অতিক্রম করিল এবং তাহার অন্নপ্রাশনের কাল উপস্থিত হইল।

অন্নপ্রাশন কালে ধর্ম্মদাস লাহার সাহায্য।

পুত্রের অন্নপ্রাশন কার্য্যে শ্রীযুত ক্ষুদিরাম নিজ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থাই প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক ৺রঘুবীরের প্রসাদী অন্ন পুত্রের মুখে প্রদান করিয়া ঐ কার্য্য শেষ করিবেন এবং তদুপলক্ষে দুই চারি জন নিকট আত্মীয়কেই নিমন্ত্রণ করিবেন—কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার পরম বন্ধু গ্রামের জমীদার শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস লাহার গুপ্ত প্রেরণায় পল্লীর প্রবীণ

ব্রাহ্মণসজ্জনগণ আসিয়া তাঁহাকে সহসা ধরিয়া বসিলেন, পুত্রের অন্নপ্রাশন দিবসে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতে হইবে। তাঁহাদিগের ঐরূপ অনুরোধে শ্রীযুত ক্ষুদিরাম আপনাকে বিশেষ বিপন্ন জ্ঞান করিলেন। কারণ, পল্লীর সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, এখন তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকে রাখিয়া কাহাকে আমন্ত্রণ করিবেন তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। আবার তাঁহাদিগের সকলকে বলিতে তাঁহার সামর্থ্য কোথায়? সুতরাং 'যাহা করেন ৶রঘুবীর' বলিয়া তিনি শ্রীযুত ধর্ম্মদাসের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ বিষয় স্থির করিতে আসিলেন এবং বন্ধুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহারই উপর উক্ত কার্য্যভার প্রদান-পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীযুত ধর্ম্মদাসও হৃষ্টচিত্তে অনেকাংশে আপন ব্যয়ে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দিলেন। আমরা শুনিয়াছি, ঐরূপে গদাধরের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে পল্লীর ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই শ্রীযুত ক্ষুদিরামের কুটীরে আসিয়া ৶রঘুবীরের প্রসাদ ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে অনেকগুলি দরিদ্র ভিক্ষুকও ঐরূপে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া তাঁহার তনয়ের দীর্ঘজীবন এবং মঙ্গল কামনা করিয়া গিয়াছিল।

দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে গদাধরের বালচেষ্টাসমূহ মধুরতর হইয়া উঠিয়া চন্দ্রা দেবীর হৃদয়কে আনন্দ ও ভয়ের পুণ্যপ্রয়াগে পরিণত করিল। পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে যিনি দেবতাদিগের নিকটে কোন বিষয় প্রার্থনা করিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন না,

সেই তিনিই এখন প্রতিদিন তনয়ের কল্যাণকামনায় শতবার, সহস্রবার, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে, তাঁহার মাতৃহৃদয়ের সকরুণ নিবেদন তাঁহাদিগের চরণে অর্পণ করিয়াও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তা হইতে পারিতেন না। ঐরূপে তনয়ের কল্যাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ শ্রীমতী চন্দ্রার ধ্যান জ্ঞান হইয়া তাঁহার ইতিপূর্ব্বের দিব্যদর্শন-শক্তিকে যে এখন ঢাকিয়া ফেলিবে, একথা সহজে বুঝিতে পারা যায়। তথাপি ঐ শক্তির সামান্য প্রকাশ তাঁহাতে এখনও মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কখন বিস্ময়ে এবং কখন বা পুত্রের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় পূর্ণ করিত। ঐ বিষয়ক একটি ঘটনা যাহা আমরা অতি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, এখানে বলিলে পাঠক পূর্ব্বোক্ত কথা সহজে বুঝিতে পারিবেন। ঘটনা এইরূপ হইয়াছিল—

চন্দ্রা দেবীর দিব্যদর্শন-শক্তির বর্ত্তমান প্রকাশ।

গদাধরের বয়ঃক্রম তখন সাত আট মাস হইবে। শ্রীমতী চন্দ্রা একদিন প্রাতে তাহাকে স্তন্যদানে নিযুক্তা ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে পুত্রকে নিদ্রিত দেখিয়া মশক দংশন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহাকে মশারি মধ্যে শয়ন করাইলেন; অনন্তর ঘরের বাহিরে যাইয়া গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। কিছুকাল গত হইলে প্রয়োজনবশতঃ ঐ ঘরে সহসা প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন মশারির মধ্যে পুত্র নাই, তৎস্থলে এক দীর্ঘকায় অপরিচিত পুরুষ মশারি জুড়িয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে! বিষম আশঙ্কায় চন্দ্রা চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং দ্রুতপদে গৃহের

ঐ বিষয়ক ঘটনা—গদাধরকে বড় দেখা।

বাহিরে আসিয়া স্বামীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ঐ কথা বলিতে বলিতে উভয়ে পুনরায় গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই, বালক যেমন নিদ্রা যাইতেছিল তেমনি নিদ্রা যাইতেছে। শ্রীমতী চন্দ্রার তাহাতেও ভয় দূর হইল না। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, 'নিশ্চয়ই কোন উপদেবতা হইতে ঐরূপ হইয়াছে; কারণ আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি পুত্রের স্থলে এক দীর্ঘাকার পুরুষ শয়ন করিয়াছিল; আমার কিছুমাত্র ভ্রম হয় নাই এবং সহসা ঐরূপ ভ্রম হইবার কোন কারণও নাই; অতএব শীঘ্র একজন বিজ্ঞ রোজা আনাইয়া সন্তানকে দেখাও, নতুবা কে জানে এই ঘটনায় পুত্রের কোন অনিষ্ট হইবে কি না?' শ্রীযুত ক্ষুদিরাম তাহাতে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'যে পুত্রের জন্মের পূর্ব্ব হইতে আমরা নানা দিব্য দর্শন লাভে ধন্য হইয়াছি তাহার সম্বন্ধে এখনও ঐরূপ কিছু দেখা বিচিত্র নহে; অতএব উহা উপদেবতাকৃত একথা তুমি মনে কখনও স্থান দিও না; বিশেষতঃ বাটীতে ৺রঘুবীর স্বয়ং বিদ্যমান; উপদেবতাসকল এখানে কি কখন সন্তানের অনিষ্ট করিতে সক্ষম? অতএব নিশ্চিন্ত হও এবং একথা অন্য কাহাকেও আর বলিও না; জানিও, ৺রঘুবীর সন্তানকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন।' শ্রীমতী চন্দ্রা স্বামীর ঐরূপ বাক্যে তখন আশ্বস্তা হইলেন বটে কিন্তু পুত্রের অমঙ্গলআশঙ্কার ছায়া তাঁহার মন হইতে সম্পূর্ণ অপসৃত হইল না। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার প্রাণের বেদনা সেদিন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কুলদেবতা ৺রঘুবীরকে নিবেদন করিলেন।

ঐরূপে আনন্দে, আবেগে, উৎসাহে, আশঙ্কায় শ্রীযুত গদাধরের জনকজননীর দিন যাইতে লাগিল এবং বালক প্রথম দিন হইতে তাঁহাদিগের এবং অন্য সকলের মনে যে মধুর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা দিন দিন দৃঢ় ও ঘনীভূত হইতে থাকিল। ক্রমে চারি পাঁচ বৎসর অতীত হইল। ঘটনার ভিতর ঐ কালের মধ্যে কোন সময়ে শ্রীযুত ক্ষুদিরামের সর্ব্বমঙ্গলা নাম্নী কনিষ্ঠা কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

গদাধরের কনিষ্ঠা ভগ্নী সর্ব্বমঙ্গলা।

বয়োবৃদ্ধির সহিত বালক গদাধরের অদ্ভুত মেধা ও প্রতিভার বিকাশ শ্রীযুত ক্ষুদিরাম এই কালে বিস্ময় ও আনন্দে অবলোকন করিয়াছিলেন। কারণ, চঞ্চল বালককে ক্রোড়ে করিয়া তিনি যখন নিজ পূর্ব্বপুরুষদিগের নামাবলী, দেবদেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তোত্র ও প্রণামাদি, অথবা রামায়ণ মহাভারত হইতে কোন বিচিত্র উপাখ্যান তাহাকে শুনাইতে বসিতেন, তখন দেখিতেন একবার মাত্র শুনিয়াই সে উহার অধিকাংশ আয়ত্ত করিয়াছে! আবার বহুদিন পরে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতেন সে ঐ সকল সমভাবে আবৃত্তি করিতে সক্ষম! সঙ্গে সঙ্গে তিনি এবিষয়েরও পরিচয় পাইয়াছিলেন যে, বালকের মন কতকগুলি বিষয়কে যেমন আগ্রহের সহিত গ্রহণ ও ধারণা করে অপর কতকগুলি বিষয়ের সম্বন্ধে আবার তেমনি উদাসীন থাকে—সহস্র চেষ্টাতেও ঐ সকলে তাহার অনুরাগ অঙ্কুরিত হয় না। গণিত শাস্ত্রের নামতা প্রভৃতি শিখাইতে যাইয়া তিনি ঐবিষয়ের আভাস পাইয়া ভাবিয়াছিলেন, চপলমতি বালককে

গদাধরের বিদ্যারম্ভ।

এত স্বল্প বয়সে ঐ সকল শিখাইবার জন্য পীড়ন করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু সে অত্যধিক চঞ্চল হইতেছে দেখিয়া পঞ্চম বর্ষেই তিনি তাহার যথাশাস্ত্র বিদ্যারম্ভ করাইয়া দিলেন এবং তাহাকে পাঠশালে পাঠাইতে লাগিলেন। বালক তাহাতে সমবয়স্ক সঙ্গী-দিগের সহিত পরিচিত হইয়া বিশেষ সুখী হইল এবং সপ্রেম ব্যবহারে শীঘ্রই তাহাদিগের এবং শিক্ষকের প্রিয় হইয়া উঠিল।

লাহাবাবুদের পাঠশালা।

গ্রামের জমীদার লাহা বাবুদের বাটীর সম্মুখস্থ বিস্তৃত নাটামণ্ডপে পাঠশালার অধিবেশন হইত এবং প্রধানতঃ তাঁহাদিগের ব্যয়েই একজন সরকার বা গুরুমহাশয় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাদিগের এবং নিকটস্থ গৃহস্থসকলের বালক-গণকে অধ্যয়ন করাইতেন। ফলতঃ পাঠশালাটি লাহাবাবুরাই একরূপ পল্লীর বালকগণের কল্যাণার্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং উহা শ্রীযুত ক্ষুদিরামের কুটীরের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। প্রাতে এবং অপরাহ্ণে দুইবার করিয়া প্রতিদিন পাঠশালা খোলা হইত। ছাত্রগণ প্রাতে আসিয়া দুই তিন ঘণ্টা পাঠ করিয়া স্নানাহার করিতে যে যাহার বাটীতে চলিয়া যাইত, এবং অপরাহ্ণ তিন চারি ঘটিকার সময় পুনরায় সমবেত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিত। গদাধরের ন্যায় তরুণবয়স্ক ছাত্রগণকে অবশ্য অত অধিক কাল পাঠাভ্যাস করিতে হইত না, কিন্তু তথায় হাজির থাকিতে হইত। সুতরাং পাঠের সময় পাঠাভ্যাস করিয়া তাহারা সেখানে বসিয়া থাকিত এবং কখন বা সঙ্গীদিগের সহিত ঐ স্থানের সন্নিকটে ক্রীড়ায় রত হইত। পাঠশালার পুরাতন ছাত্রেরা আবার নূতন ছাত্রদিগকে

পাঠ বলিয়া দিত এবং তাহারা পুরাতন পাঠ নিত্য অভ্যাস করে কিনা তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিত।

এইরূপে একজন মাত্র শিক্ষক নিযুক্ত থাকিলেও পাঠশালার কার্য্য সুচারুভাবে চলিয়া যাইত। গদাধর যখন পাঠশালে প্রথম প্রবেশ করে তখন শ্রীযুত যদুনাথ সরকার তথায় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। উহার কিছুকাল পরে তিনি নানা কারণে ঐ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুত রাজেন্দ্র নাথ সরকার নামক এক ব্যক্তি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পাঠশালার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বালকের বিচিত্র চরিত্র সম্বন্ধে ক্ষুদিরামের অভিজ্ঞতা।

বালকের জন্মিবার পূর্ব্বে তাহার মহৎ জীবনের পরিচায়কস্বরূপে শ্রীযুত ক্ষুদিরাম যে সকল অদ্ভুত স্বপ্ন ও দর্শনাদি লাভ করিয়াছিলেন সেই সকল তাঁহার মনে চিরকালের নিমিত্ত দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং বালসুলভ চপলতায় সে এখন কোনরূপ অশিষ্টাচরণ করিতেছে দেখিলেও তিনি তাহাকে মৃদুবাক্যে নিষেধ করা ভিন্ন কখনও কঠোরভাবে দমন করিতে সক্ষম হইতেন না। কারণ সকলের ভালবাসা পাইয়াই হউক বা নিজ স্বভাবগুণেই হউক তাহাতে তিনি এখন সময়ে সময়ে অনাশ্রবতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু ঐজন্য অপর পিতামাতা-সকলের ন্যায় তাহাকে কখন তাড়ন করা দূরে থাকুক, তিনি ভাবিতেন, উহাই বালককে ভবিষ্যতে বিশেষরূপে উন্নত করিবে। ঐরূপ ভাবিবার যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান ছিল। কারণ, তিনি দেখিতেন, দুরন্ত বালক কখন কখন পাঠশালায় না যাইয়া সঙ্গিগণকে

লইয়া গ্রামের বহির্ভাগে ক্রীড়ায় রত থাকিলে অথবা কাহাকেও না বলিয়া নিকটবর্ত্তী কোন স্থলে যাত্রা গান শুনিতে যাইলেও যখন যাহা ধরিত, তাহা না সম্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত হইত না, মিথ্যা-সহায়ে নিজকৃত কোন কর্ম্ম কখনও ঢাকিতে প্রয়াস পাইত না এবং সর্ব্বোপরি তাহার প্রেমিক হৃদয় তাহাকে কখনও কাহারও অনিষ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত করিত না। ঐরূপ হইলেও কিন্তু এক বিষয়ের জন্য শ্রীযুত ক্ষুদিরাম কিছু চিন্তিত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, হৃদয় স্পর্শ করে এমন ভাবে কোন কথা না বলিতে পারিলে উহা বিধি বা নিষেধ যাহাই হউক না কেন, বালক উহার কিছুমাত্র গ্রহণ করা দূরে থাকুক সর্ব্বথা তদ্বিপরীতাচরণ করিয়া বসে। উহা তাহার সকল বিষয়ের কারণ-জিজ্ঞাসার পরিচায়ক হইলেও সংসারের সর্ব্বত্র বিপরীত রীতির অনুষ্ঠান দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, কেহই বালককে ঐরূপে সকল বিষয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবে না এবং তজ্জন্য অনেক সময়ে তাহার সদ্বিধিসকল মান্য না করিয়া চলিবার সম্ভাবনা। এই সময়ের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় শ্রীযুত ক্ষুদিরামের মনে বালকের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত চিন্তাসকল উদিত হইয়াছিল এবং এখন হইতে তিনি তাহার মনের ঐরূপ প্রকৃতি বুঝিয়া তাহাকে সতর্কভাবে শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঘটনাটি ইহাই—

শ্রীযুত ক্ষুদিরামের বাটীর একরূপ পার্শ্বেই হালদারপুকুর নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণী বিদ্যমান। পল্লীর সকলে উহার স্বচ্ছ সলিলে স্নান পান ও রন্ধনাদি কার্য্য করিত। অবগাহনের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ-

দিগের নিমিত্ত দুইটি বিভিন্ন ঘাট নির্দ্দিষ্ট ছিল। গদাধরের ন্যায় তরুণবয়স্ক বালকেরা স্নানার্থ স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘাটে অনেক সময়ে গমন করিত। দুই চারি জন বয়স্যের সহিত গদাধর এক দিন ঐ ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া জলে উল্লম্ফন, সন্তরণাদির দ্বারা বিষম গণ্ডগোল আরম্ভ করিল। উহাতে স্নানের জন্য সমাগতা স্ত্রীলোকদিগের অসুবিধা হইতে লাগিল। সন্ধ্যাহ্নিক কর্ম্মে নিযুক্তা বর্ষীয়সী রমণীগণের অঙ্গে জলের ছিটা লাগায়, নিষেধ করিয়াও তাঁহারা বালকদিগকে শান্ত করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'তোরা এ ঘাটে কি করিতে আসিস্? পুরুষদিগের ঘাটে যাইতে পারিস্ না? এঘাটে স্ত্রীলোকেরা স্নানান্তে পরিধেয় বসনাদি ধৌত করে—জানিস্ না, স্ত্রীলোকদিগকে উলঙ্গিনী দেখিতে নাই?' গদাধর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন দেখিতে নাই?' তিনি তাহাতে সে বুঝিতে পারে এমন কোন কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া তাহাকে অধিকতর তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিরক্ত হইয়াছেন এবং বাটীতে পিতামাতাকে বলিয়া দিবেন ভাবিয়া বালকগণ তখন অনেকটা নিরস্ত হইল। গদাধর কিন্তু উহাতে মনে মনে অন্যরূপ সঙ্কল্প করিল। সে দুই তিন দিন রমণীগণের স্নানের সময় পুষ্করিণীর পাড়ে বৃক্ষের আড়ালে লুক্কায়িত থাকিয়া তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বর্ষীয়সী রমণীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বলিল, 'পরশু চারিজন রমণীকে স্নানকালে লক্ষ্য করিয়াছি, কাল ছয় জনকে এবং আজ আট জনকে ঐরূপ করিয়াছি—কিন্তু

ঐ বিষয়ক ঘটনা।

কৈ আমার কিছুই ত হইল না?' বর্ষীয়সী রমণী তাহাতে শ্রীমতী চন্দ্রা দেবীর নিকটে আগমনপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে ঐ কথা বলিয়া দিলেন। শ্রীমতী চন্দ্রা তাহাতে গদাধরকে অবসরকালে নিকটে পাইয়া মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন, "ঐরূপ করিলে তোমার কিছু হয় না কিন্তু রমণীগণ আপনাদিগকে বিশেষ অপমানিতা জ্ঞান করেন, তাঁহারা আমার সদৃশা, তাঁহাদিগকে অপমান করিলে আমাকেই অপমান করা হয়। অতএব আর কখনও ঐরূপে তাঁহা-দিগের সম্মানের হানি করিও না, তাঁহাদিগের ও আমার মনে পীড়া দেওয়া কি ভাল?" বালকও তাহাতে বুঝিয়া তদবধি ঐরূপ আচরণ আর কখনও করিল না।

গদাধরের শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার।

সে যাহা হউক, পাঠশালে যাইয়া গদাধরের শিক্ষা মন্দ অগ্রসর হইতে লাগিল না। সে অল্পকালের মধ্যেই সামান্য ভাবে পড়িতে এবং লিখিতে সমর্থ হইল। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের উপর তাহার বিদ্বেষ চিরদিন প্রায় সমভাবেই রহিল। অন্যদিকে বালকের অনুকরণ ও উদ্ভাবনী শক্তি দিন দিন নানা নূতন দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। গ্রামের কুম্ভকারগণকে দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন করিতে দেখিয়া বালক তাহাদিগের নিকট যাতায়াত ও জিজ্ঞাসা করিয়া বাটীতে ঐ বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিল, এবং উহা তাহার ক্রীড়ার অন্যতমরূপে পরিগণিত হইল। পটব্যবসায়িগণের সহিত মিলিত হইয়া সে ঐরূপে চিত্র অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিল। গ্রামের কোথাও পুরাণকথা অথবা যাত্রাগান হইতেছে শুনিলেই সে তথায় গমন করিয়া শাস্ত্রোপাখ্যানসকল শিখিতে লাগিল এবং শ্রোতাদিগের

নিকটে ঐ সকল কিরূপে প্রকাশ করিলে তাহাদিগের বিশেষ প্রীতিকর হয় তাহা তন্ন তন্ন ভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিল। বালকের অপূর্ব্ব স্মৃতি ও মেধা তাহাকে ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিল।

আবার সদানন্দ বালকের রঙ্গরসপ্রিয়তা তাহার অদ্ভুত অনুকরণ-শক্তিসহায়ে প্রবৃদ্ধ হইয়া একদিকে যেমন তাহাকে নরনারীর বিশেষ বিশেষ হাবভাব অভিনয় করিতে এই বয়স হইতেই প্রবৃত্ত করিল, অন্যদিকে তেমনি তাহার মনের স্বাভাবিক সরলতা ও দেব ভক্তি তাহার জনক-জননীর দৈনন্দিন অনুষ্ঠানসকলের দৃষ্টান্তে দ্রুতপদে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন ঐ কথা যে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ ও স্বীকার করিয়াছে তাহা দক্ষিণেশ্বরে আমাদের নিকটে উক্ত নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতে পাঠক বিশেষরূপে প্রণিধান করিতে পারিবেন—"আমার জননী মূর্ত্তিমতী সরলতাস্বরূপা ছিলেন। সংসারের কোন বিষয় বুঝিতেন না, টাকা পয়সা গণনা করিতে জানিতেন না, কাহাকে কোন্ বিষয় বলিতে নাই তাহা না জানাতে আপনার পেটের কথা সকলের নিকটেই বলিয়া ফেলিতেন, সেজন্য লোকে তাঁহাকে 'হাউড়ো' বলিত— এবং সকলকে আহার করাইতে বড় ভালবাসিতেন। আমার জনক কখনই শূদ্রের দান গ্রহণ করেন নাই, পূজা, জপ, ধ্যানে দিনের ভিতর অধিক কাল যাপন করিতেন, প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবার কালে 'আয়াহি বরদে দেবি' ইত্যাদি গায়ত্রীর আবাহন উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার বক্ষ স্ফীত ও রক্তিম হইয়া উঠিত এবং নয়নের অশ্রুধারায় ভাসিয়া যাইত, আবার যখন

পূজাদিতে নিযুক্ত না থাকিতেন তখনও তিনি ৺রঘুবীরকে সাজাই-বার জন্য স্থচ সূতা ও পুষ্প লইয়া মালা গাঁথিয়া সময়ক্ষেপ করিতেন, মিথ্যাসাক্ষ্য দিবার ভয়ে তিনি পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করিয়াছিলেন, গ্রামের লোকে তাঁহাকে ঋষির ন্যায় মান্য ভক্তি করিত।”

বালকের সাহস।

বালকের অসীম সাহসের পরিচয়ও দিন দিন পাওয়া যাইতেছিল। বয়োবৃদ্ধেরাও যেখানে ভূত-প্রেতাদির ভয়ে জড়সড় হইত, বালক সেখানে অকুতোভয়ে গমনাগমন করিত। তাহার পিতৃষ্বসা শ্রীমতী রামশীলার উপর কখন কখন ৺শীতলাদেবীর ভাবাবেশ হইত। তখন তিনি যেন ভিন্ন এক ব্যক্তি হইয়া যাইতেন। কামারপুকুরে ভ্রাতার নিকটে এই সময়ে অবস্থানকালে একদিন তাঁহার সহসা ঐরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া পরিবারস্থ সকলের মনে ভয় ও ভক্তির উদয় করিয়াছিল। তাঁহার ঐরূপ অবস্থা শ্রদ্ধার সহিত সন্দর্শন করিলেও কিন্তু গদাধর উহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই। সে তাঁহার সন্নিকটে অবস্থান পূর্ব্বক তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল এবং পরে বলিয়াছিল, “পিসিমার ঘাড়ে যে আছে, সে যদি আমার ঘাড়ে চাপে ত বেশ হয়!”

কামারপুকুরের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে অবস্থিত ভূরস্থবো অথবা ভূরশোভা নামক গ্রামের বিশিষ্ট দাতা ও ভক্ত জমীদার মাণিকরাজার কথা আমরা পাঠককে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। শ্রীযুত ক্ষুদিরামের ধর্ম্মপরায়ণতায় আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার সহিত বিশেষ সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ছয় বৎসরের বালক গদাধর পিতার সহিত একদিন মাণিকরাজার বাটীতে যাইয়া সকলের প্রতি এমন

চিরপরিচিতের ন্যায় নিঃসঙ্কোচ মধুর ব্যবহার করিয়াছিল যে সেই দিন হইতেই সে তাঁহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। মাণিকরাজার ভ্রাতা শ্রীযুত রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন বালককে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরামকে বলিয়াছিলেন, "সখা, তোমার এই পুত্রটি সামান্য নহে, ইহাতে দেব-অংশ বিশেষভাবে বিদ্যমান বলিয়া জ্ঞান হয়! তুমি যখন এদিকে আসিবে, বালককে সঙ্গে লইয়া আসিও, উহাকে দেখিলে পরম আনন্দ হয়।" শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ইহার পরে নানা কারণে মাণিকরাজার বাটিতে কিছুদিন যাইতে পারেন নাই। মাণিকরাজা উহাতে নিজ পরিবারস্থ একজন রমণীকে সংবাদ লইতে এবং সুস্থ থাকিলে গদাধরকে কিছুক্ষণের জন্য ভূরসুবো গ্রামে আনয়ন করিতে পাঠান। বালক তাহাতে পিতার আদেশে সানন্দে উক্ত রমণীর সহিত আগমন করিয়াছিল এবং সমস্ত দিবস তথায় থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে নানাবিধ মিষ্টান্ন এবং কয়েকখানি অলঙ্কার উপহার লইয়া কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। গদাধর ক্রমে এই ব্রাহ্মণ পরিবারের এত প্রিয় হইয়া উঠে যে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ভূরসুবো যাইতে কয়েক দিন বিলম্ব করিলেই তাঁহারা লোক পাঠাইয়া তাহাকে লইয়া যাইতেন।

বালকের অপরের সহিত মিলিত হইবার শক্তি।

ঐরূপে দিন, পক্ষ, মাস অতীত হইয়া বালক ক্রমে সপ্তম বর্ষে প্রবেশ করিল এবং শৈশবের মাধুর্য্য ঘনীভূত হইয়া তাহাকে এখন দিন দিন সকলের অধিকতর প্রিয় করিয়া তুলিল! পল্লীবাসিনী রমণীগণ বাটীতে কোনরূপ সুখাদ্য প্রস্তুত করিবার

সময় তাহাকে উহার কিয়দংশ কেমন করিয়া ভোজন করাইবেন সেই কথাই অগ্রে চিন্তা করিতেন, সমবয়স্ক বালক-বালিকাগণ তাহাদিগের ভোজ্যাংশ তাহার সহিত ভাগ করিয়া খাইয়া আপনাদিগকে অধিকতর পরিতৃপ্ত বোধ করিত, এবং প্রতিবাসী সকলে তাহার মধুর কথা, সঙ্গীত ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহার বালসুলভ দৌরাত্ম্যসকল হৃষ্টচিত্তে সহ্য করিত। এই কালের একটি ঘটনায় বালক তাহার জনকজননী এবং বন্ধুবর্গকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিয়াছিল। ঈশ্বরকৃপায় গদাধর সুস্থ ও সবল শরীর লইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং জন্মাবধি একাল পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ কোনও ব্যাধি হয় নাই। বালক সেজন্য গগনচারী বিহঙ্গের ন্যায় অপূর্ব্ব স্বাধীনতা ও চিত্তপ্রসাদে দিন যাপন করিত। শরীরবোধরাহিত্যই পূর্ণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ভিষক্‌গণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বালক জন্মাবধি ঐরূপ স্বাস্থ্যসুখ অনুভব করিতেছিল। তদুপরি তাহার স্বাভাবিক একাগ্র চিত্ত বিষয়বিশেষে যখন নিবিষ্ট হইত তখন তাহার শরীরবুদ্ধির অধিকতর হ্রাস হইয়া তাহাকে যেন এককালে ভাবময় করিয়া তুলিত। বিশুদ্ধ-বায়ু আন্দোলিত প্রান্তরের হরিৎ-সুন্দর ছবি, নদীর অবিরাম প্রবাহ, বিহঙ্গের কলগান এবং সর্ব্বোপরি সুনীল অম্বর ও তন্মধ্যগত প্রতিক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীল অভ্রপুঞ্জের মায়ারাজ্য প্রভৃতি যখন যে পদার্থ আপন রহস্যময় প্রতিকৃতি তাহার মনের সম্মুখে আপন মহিমা প্রসারিত করিয়া উহাকে আকৃষ্ট করিত, বালক তখনই তাহাকে লইয়া আত্মহারা হইয়া ভাবরাজ্যের কোন এক

গদাধরের ভাবুকতার অসাধারণ পরিণাম।

সুদূর নিভৃত প্রদেশে প্রবিষ্ট হইত। বর্ত্তমান ঘটনাটিও তাহার ভাবপ্রবণতা হইতে উপস্থিত হইয়াছিল।* প্রান্তরমধ্যে যদৃচ্ছা পরিভ্রমণ করিতে করিতে বালক নবজলধর-ক্রোড়ে বলাকাশ্রেণীর শ্বেতপক্ষবিস্তারপূর্ব্বক সুন্দর স্বাধীন পরিভ্রমণ দেখিয়া এতদূর তন্ময় হইয়াছিল যে, তাহার নিজ শরীরের ও জাগতিক অন্য সকল পদার্থের বোধ এককালে লোপ হইয়াছিল এবং সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সে প্রান্তর-পথে পড়িয়া গিয়াছিল। বয়স্যগণ তাহার ঐরূপ অবস্থা দর্শনে ভীত ও বিপন্ন হইয়া তাহার জনকজননীকে সংবাদ প্রদান করে এবং তাহাকে ধরাধরি করিয়া প্রান্তর হইতে বাটীতে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। চেতনালাভের কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু সে আপনাকে পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ বোধ করিয়াছিল। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ও শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী যে, এই ঘটনায় বিষম ভাবিত হইয়াছিলেন এবং আর যাহাতে তাহার ঐরূপ অবস্থা না হয় সেজন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। ফলতঃ তাঁহারা উহাতে বালকের মূর্চ্ছারূপ বিষম ব্যাধির সূচনা অবলোকন করিয়া ঔষধাদি প্রয়োগে এবং শান্তি স্বস্ত্যয়নাদিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বালক গদাধর কিন্তু তাঁহাদিগকে ঐ ঘটনাসম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিল, তাহার মন এক অভিনব অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ভাবে লীন হইয়াছিল বলিয়াই, তাহার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল এবং বাহিরে অন্যরূপ দেখাইলেও তাহার ভিতরে সংজ্ঞা এবং এক প্রকার অপূর্ব্ব আনন্দের বোধ ছিল। সে যাহা হউক, তাহার

* ঠাকুর এই ঘটনাসম্বন্ধে নিজমুখে যেরূপ বলিয়াছিলেন তজ্জন্য "সাধকভাব"—২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ঐরূপ অবস্থা তখন আর না হওয়াতে এবং তাহার স্বাস্থ্যের কোনরূপ ব্যতিক্রম না দেখিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ভাবিয়াছিলেন, উহা কোনরূপ বায়ুর প্রকোপে সাময়িক উপস্থিত হইয়াছিল; এবং শ্রীমতী চন্দ্রা স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন, উপদেবতার নজর লাগিয়া তাহার ঐরূপ হইয়াছিল। কিন্তু ঐ ঘটনার জন্য তাঁহারা বালককে পাঠশালায় কিছুকাল যাইতে দেন নাই। বালক তাহাতে প্রতিবেশিগণের গৃহে এবং গ্রামের সর্ব্বত্র যদৃচ্ছা পরিভ্রমণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রীড়াকৌতুকপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

রামচাঁদের বাটীতে ৺দুর্গোৎসব।

ঐরূপে বালকের সপ্তম বর্ষের অর্দ্ধেক কাল অতীত হইয়া ক্রমে সন ১২৪৯ সালের শারদীয়া মহাপূজার সময় উপস্থিত হইল। শ্রীযুত ক্ষুদিরামের কৃতী ভাগিনেয় রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি। কর্ম্মস্থল বলিয়া মেদিনীপুরে বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত করিলেও সেলামপুর নামক গ্রামেই তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল; এবং তাঁহাব পরিবারবর্গ ঐ স্থানেই বাস করিত। শ্রীযুত রামচাঁদ ঐ গ্রামে প্রতিবৎসর শারদীয়া মহাপূজার অনুষ্ঠান করিয়া অনেক টাকা ব্যয় করিতেন। হৃদয়রামের নিকট শুনিয়াছি পূজার সময় রামচাঁদের সেলামপুরের ভবন অষ্টাহকাল গীতবাদ্যে মুখরিত হইয়া থাকিত এবং ব্রাহ্মণভোজন, পণ্ডিতবিদায়, দরিদ্রভোজন ও তাহাদিগকে বস্ত্রদান প্রভৃতি কার্য্যে তথায় আনন্দের স্রোত ঐ কাল নিরন্তর প্রবাহিত হইত। শ্রীযুত রামচাঁদ এতদুপলক্ষে তাঁহার পরম শ্রদ্ধাস্পদ মাতুলকে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া এই সময়ে কিছুকাল তাঁহার সহিত আনন্দে

অতিবাহিত করিতেন। বর্ত্তমান বৎসরেও শ্রীযুত ক্ষুদিরাম তাঁহার পরিবারবর্গ রামচাঁদের সাদর নিমন্ত্রণ যথাসময়ে প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুত ক্ষুদিরাম এখন অষ্টষষ্টিতম বর্ষ প্রায় অতিক্রম করিতে বসিয়াছেন এবং কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে মধ্যে মধ্যে অজীর্ণ ও গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সুদৃঢ় শরীর এখন বলহীন হইয়াছিল। সেজন্য প্রিয় ভাগিনেয় রাম-চাঁদের সাদরাহ্বানে তাহার ভবনে যাইতে ইচ্ছা হইলেও তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; নিজ দরিদ্র কুটীর এবং পরিবারবর্গকে, বিশেষতঃ গদাধরকে কয়েক দিনের জন্য ছাড়িয়া যাইতেও তিনি অন্তরে একটা কারণশূন্য অথচ প্রবল অনিচ্ছা অনুভব করিতে লাগিলেন। আবার ভাবিলেন, শরীর যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে তাহাতে এ বৎসর না যাইলে আর কখনও যাইতে পারিবেন কি না তাহা কে বলিতে পারে? অতএব স্থির করিলেন গদাধরকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। পরক্ষণে নিশ্চয় করিলেন, গদাধরকে সঙ্গে লইলে শ্রীমতী চন্দ্রা বিশেষ উদ্বিগ্না থাকিবেন। অগত্যা জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারের সহিত যাইয়া পূজার কয়টা দিন রামচাঁদের নিকটে কাটাইয়া আসিবেন ইহাই স্থির করিলেন এবং ৺রঘুবীরকে প্রণামপূর্ব্বক সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ এবং গদাধরের মুখচুম্বন করিয়া তিনি পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে সেলামপুর যাত্রা করিলেন। রামচাঁদও পূজার্হ মাতুল ও ভ্রাতা রামকুমারকে নিকটে পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলেন।

ক্ষুদিরাম ও রামকুমারের রামচাঁদের বাটীতে গমন।

এখানে পৌঁছিবার পরেই কিন্তু শ্রীযুত ক্ষুদিরামের গ্রহণীরোগ পুনরায় দেখা দিল এবং তাঁহার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ষষ্ঠী,

সপ্তমী ও অষ্টমীর দিন মহানন্দে কাটিয়া গেল। কিন্তু নবমীর দিনে আনন্দের হাটে নিরানন্দ উপস্থিত হইল, শ্রীযুত ক্ষুদিরামের ব্যাধি প্রবলভাব ধারণ করিল। রামচাঁদ উপযুক্ত বৈদ্যগণ আনাইয়া এবং ভগ্নী হেমাঙ্গিনী ও রামকুমারের সাহায্যে সযত্নে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সঞ্চিত রোগের উপশম হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নবমীর দিন ও রাত্রি কোনরূপে কাটিয়া যাইয়া হিন্দুর বিশেষ পবিত্র সম্মিলনের দিন বিজয়া দশমী সমাগত হইল। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম অদ্য এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল।

ক্ষুদিরামের ব্যাধি ও দেহত্যাগ।

ক্রমে অপরাহ্ণ সমাগত হইলে রামচাঁদ প্রতিমা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সত্বর মাতুলের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিতপ্রায়। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, শ্রীযুত ক্ষুদিরাম অনেকক্ষণ হইতে নির্ব্বাক্ হইয়া ঐরূপ জ্ঞানশূন্যের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন রামচাঁদ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “মামা, তুমি যে সর্ব্বদা ‘রঘুবীর রঘুবীর’ বলিয়া থাক, এখন বলিতেছ না কেন?” ঐ নাম শ্রবণ করিয়া সহসা শ্রীযুত ক্ষুদিরামের চৈতন্য হইল। তিনি ধীরে ধীরে কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, ‘কে? রামচাঁদ, প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আসিলে? তবে আমাকে একবার বসাইয়া দাও।’ অনন্তর রামচাঁদ, হেমাঙ্গিনী ও রামকুমার তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া অতি সন্তর্পণে শয্যায় উপবেশন করাইয়া দিবামাত্র তিনি গম্ভীর স্বরে

তিনবার ৺রঘুবীরের নামোচ্চারণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলেন। বিন্
সিন্ধুর সহিত মিলিত হইল—৺রঘুবীর ভক্তের পৃথক জীবনবিন্
নিজ অনন্ত জীবনে সম্মিলিত করিয়া তাহাকে অমর ও পূর্ণ শান্তির
অধিকারী করিলেন! পরে গভীর নিশীথে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে গ্রাম
মুখরিত হইয়া উঠিল এবং শ্রীযুত ক্ষুদিরামের দেহ নদীকূলে আনীত
হইলে উহাতে অগ্নিসংস্কার করা হইল। পরদিন ঐ সংবাদ অগ্রসর
হইয়া কামারপুকুরের আনন্দধাম নিরানন্দে পূর্ণ করিল।

অনন্তর অশৌচান্তে শ্রীযুত রামকুমার শাস্ত্রবিধানে বৃষোৎসর্গ
এবং বহু ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পূর্ণ
করিলেন। শুনা যায়, মাতুলের শ্রাদ্ধক্রিয়ায় শ্রীযুত রামচাঁদ পাঁচ
শত টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

গদাধরের কৈশোরকাল।

শ্রীযুত ক্ষুদিরামের দেহাবসানে তাঁহার পরিবারবর্গের জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। বিধাতার বিধানে শ্রীমতী চন্দ্রা দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর সুখে দুঃখে তাঁহাকে জীবন-সহচররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে হারাইয়া তিনি যে এখন জগৎ শূন্য দেখিবেন, এবং প্রাণে একটা চিরস্থায়ী অভাব প্রতিক্ষণ অনুভব করিবেন, ইহা বলিতে হইবে না। সুতরাং শ্রীশ্রীরঘুবীরের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণে চিরাভ্যস্ত তাঁহার মনের গতি এখন সংসার ছাড়িয়া সেই দিকেই নিরন্তর প্রবাহিত থাকিল। কিন্তু মন ছাড়িতে চাহিলেও যতদিন না কালপূর্ণ হয় ততদিন সংসার তাহাকে ছাড়িবে কেন? সাত বৎসরের পুত্র গদাধর এবং চারি বৎসরের কন্যা সর্ব্বমঙ্গলার চিন্তার ভিতর দিয়া প্রবেশ লাভ করিয়া আবার সংসার তাহাকে দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখে ধীরে ধীরে ফিরাইয়া আনিতে লাগিল। সুতরাং ৺রঘুবীরের সেবায় এবং কনিষ্ঠ পুত্রকন্যার পালনে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীমতী চন্দ্রার দুঃখের দিন কোনরূপে কাটিতে লাগিল।

ক্ষুদিরামের মৃত্যুতে তৎ-পরিবারবর্গের জীবনে যে সকল পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল।

অন্য দিকে পিতৃবৎসল রামকুমারের স্কন্ধে এখন সংসারের সমগ্র ভার পতিত হওয়ায় তাঁহার বৃথা শোকে কালক্ষেপ করিবার অবসর

রহিল না। শোকসন্তপ্তা জননী এবং তরুণবয়স্ক ভ্রাতা ও ভগ্নী যাহাতে কোনরূপ অভাবগ্রস্ত হইয়া কষ্ট না পায়, অষ্টাদশ বর্ষীয় মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর যাহাতে স্মৃতি ও জ্যোতিষাদি অধ্যয়ন শেষ করিয়া উপার্জ্জনক্ষম হইয়া সংসারে সাহায্য করিতে পারে, স্বয়ং যাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা আয়বৃদ্ধি করিয়া পারিবারিক অবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে পারেন—ঐরূপ শত চিন্তা ও কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তাঁহার এখন দিন যাইতে লাগিল। তাঁহার কর্ম্মকুশলা গৃহিণীও চন্দ্রা দেবীকে অসমর্থা দেখিয়া পরিবারবর্গের আহারাদি এবং অন্যান্য গৃহকর্ম্মের বন্দোবস্তের অধিকাংশ ভার গ্রহণ করিলেন।

ঐ ঘটনায় গদাধরের মনের অবস্থা।

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, শৈশবে মাতৃবিয়োগ, কৈশোরে পিতৃ-বিয়োগ এবং যৌবনে স্ত্রীবিয়োগ জীবনে যত অভাব আনয়ন করে এত বোধ হয় অন্য কোন ঘটনা করে না। মাতার আদর যত্নই শৈশবে প্রধান অবলম্বন থাকে, সেজন্য পিতার দেহান্ত হইলেও শিশু তাঁহার অভাব তখন উপলব্ধি করে না। কিন্তু বুদ্ধির উন্মেষের সহিত কৈশোরে উপস্থিত হইয়া সেই শিশু যখন পিতার অমূল্য ভালবাসার দিন দিন পরিচয় লাভ করিতে থাকে, স্নেহময়ী জননী তাহার যে সকল অভাব পূর্ণ করিতে অসমর্থা পিতার দ্বারা সেই সকল অভাব মোচিত হইয়া তাহার হৃদয় যখন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, সে সময়ে পিতৃবিয়োগ উপস্থিত হইলে তাহার জীবনে অভাববোধের পরিসীমা থাকে না। পিতৃবিয়োগে গদাধরের ঐরূপ হইয়াছিল। প্রতিদিন নানা ক্ষুদ্র ঘটনা তাহাকে পিতার অভাব স্মরণ করাইয়া তাহার অন্তরের অন্তর বিষাদের গাঢ় কালিমায়

সর্ব্বদা রঞ্জিত করিয়া রাখিত। কিন্তু তাহার হৃদয় ও বুদ্ধি এই বয়সেই অন্যাপেক্ষা অনেক অধিক পরিপক্ক হওয়ায় মাতার দিকে চাহিয়া সে উহা বাহিরে কখনও প্রকাশ করিত না। সকলে দেখিত বালক পূর্ব্বের ন্যায় সদানন্দে হাস্য কৌতুকাদিতে কাল যাপন করিতেছে। ভূতির খালের শ্মশান, মাণিকবাজার আম্রকানন প্রভৃতি গ্রামের জনশূন্য স্থানসকলে তাহাকে কখন কখন একাকী বিচরণ করিতে দেখিলেও বালসুলভ চপলতা ভিন্ন অন্য কোন কারণে সে তথায় উপস্থিত হইয়াছে এ কথা কাহারও মনে উদয় হইত না। বালক কিন্তু এখন হইতে চিন্তাশীল ও নির্জ্জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে এবং সংসারের সকল ব্যক্তিকে তাহার চিন্তার বিষয় করিয়া তাহাদিগের আচরণ তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল।

চন্দ্রা দেবীর প্রতি গদাধরেব বর্ত্তমান আচরণ।

সমসমান অভাববোধই মানবকে সংসারে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া থাকে। সেই জন্যই বোধ হয় বালক তাহার মাতার প্রতি এখন একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল। সে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সময় এখন তাঁহার নিকটে থাকিতে এবং দেবসেবা ও গৃহকর্ম্মাদিতে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। সে নিকটে থাকিলে জননী নিজ জীবনের অভাববোধ যে অনেকটা ভুলিয়া থাকেন একথা লক্ষ্য করিতে বালকের বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু মাতার প্রতি বালকের আচরণ এখন কিছু ভিন্নাকার ধারণ করিয়াছিল। কারণ, পিতার মৃত্যুর পরে বালক কোন বিষয় লাভের জন্য চন্দ্রা দেবীকে পূর্ব্বের ন্যায় আবদার করিয়া কখনও ধরিত না। সে বুঝিত জননী ঐ

বিষয় দানে অসমর্থা হইলে তাঁহার শোকাগ্নি পুনরুদ্দীপিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ যন্ত্রণা অনুভব করাইবে। ফলতঃ পিতৃবিয়োগে মাতাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবার ভাব তাহার হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠিল।

গদাধরের এই কালের চেষ্টা ও সাধুদিগের সহিত মিলন।

গদাধর পাঠশালায় যাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকিল, কিন্তু পুরাণ কথা ও যাত্রা গান শ্রবণ করা এবং দেব দেবীর মূর্ত্তিসকল গঠন করা তাহার নিকট এখন অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠিল। পিতার অভাববোধ ঐ সকল বিষয়ের আনুকূল্যে অনেকাংশে বিস্মৃত হইতে পারা যায় দেখিয়াই বোধ হয় সে উহাদিগকে এখন বিশেষ রূপে অবলম্বন করিয়াছিল। বালকের অসাধারণ স্বভাব তাহাকে এই কালে অন্য এক অভিনব বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। গ্রামের অগ্নিকোণে পুরী যাইবার পথের উপর জমীদার লাহা বাবুরা যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য একটি পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ৺জগন্নাথ দর্শনে যাইবার ও তথা হইতে আসিবার কালে সাধু বৈরাগীরা অনেক সময় উহাতে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক গ্রামে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিত। গদাধর সংসারের অনিত্যতার কথা ইতিপূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিল এবং পিতার মৃত্যুতে ঐ বিষয়ের সাক্ষাৎ পরিচয়ও এখন লাভ করিয়াছিল। সাধু বৈরাগীরা অনিত্য সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া কালযাপন করে এবং সাধুসঙ্গ মানবকে চরম শান্তিদানে কৃতার্থ করে পুরাণমুখে একথা জানিয়া বালক সাধুদিগের সহিত পরিচিত হইবার আশয়ে উক্ত পান্থনিবাসে এখন হইতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত

করিতে লাগিল। প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে ধুনীমধ্যগত পবিত্র অগ্নি উজ্জ্বল করিয়া তাঁহারা যেভাবে ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন হন, ভিক্ষা-লব্ধ সামান্য আহার নিজ ইষ্টদেবতাকে নিবেদনপূর্ব্বক যে ভাবে তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে প্রসাদ গ্রহণ করেন, ব্যাধির প্রবল প্রকোপে পড়িলে যেভাবে তাঁহারা শ্রীভগবানের মুখাপেক্ষী থাকিয়া উহা অকাতরে সহ্য করিতে চেষ্টা করেন, আপনার বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যও তাঁহারা যে ভাবে কাহাকেও উদ্বিগ্ন করিতে পরাঙ্মুখ হন, আবার তাঁহাদিগের ন্যায় বেশভূষাকারী ভণ্ড ব্যক্তিগণ যে ভাবে সর্ব্বপ্রকার সদাচারের বিপরীতাচরণ করিয়া স্বার্থসুখসাধনের নিমিত্ত জীবনধারণ করে—ঐসমস্ত বিষয় বালকের এখন অবসরকালে লক্ষ্যের বিষয় হইল। ক্রমে সে যথার্থ সাধুগণকে দেখিলে রন্ধনাদির জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ, পানীয়জল আনয়ন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে সহায়তা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিল। তাঁহারাও প্রিয়দর্শন বালকের মধুর আচরণে পরিতৃপ্ত হইয়া তাহাকে ভগবদ্ভজন শিখাইতে, নানাভাবে সদুপদেশ প্রদান করিতে এবং প্রসাদী ভিক্ষান্নের কিয়দংশ তাহাকে দিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া ভোজন করিতে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশ্য যে সকল সাধু পান্থনিবাসে কোন কারণে অধিককাল বাস করিতেন তাঁহাদিগের সহিতই বালক ঐভাবে মিশিতে সমর্থ হইল।

গদাধরের অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কয়েকজন সাধু অত্যধিক পথশ্রম নিবারণের জন্য অথবা অন্য কোন কারণে লাহাবাবুদের পান্থনিবাসে ঐরূপে অধিক কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। বালক তাঁহাদিগের সহিত পূর্ব্বোক্তভাবে মিলিত হইয়া শীঘ্রই

তাঁহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠিল। তাঁহাদিগের সহিত তাহার ঐরূপে মিলিত হইবার কথা প্রথম প্রথম কেহই জানিতে পারিল না, কিন্তু বালক যখন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের সহিত অধিককাল কাটাইতে লাগিল তখন ঐকথা কাহারও জানিতে বাকি রহিল না। কারণ, কোন কোন দিন সে তাঁহাদিগের নিকটে প্রচুর আহার করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আর কিছুই খাইল না এবং চন্দ্রা দেবী কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহাকে সমস্ত কথা নিবেদন করিল। শ্রীমতী চন্দ্রা উহাতে প্রথম প্রথম উদ্বিগ্না হইলেন না, বালকের প্রতি সাধুগণের প্রসন্নতা আশীর্ব্বাদ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া তিনি তাহাকে দিয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর খাদ্য দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু বালক যখন পরে কোন দিন বিভূতিভূষিতাঙ্গ হইয়া, কোন দিন তিলক ধারণ, আবার কোন দিন বা নিজ পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করিয়া সাধুদিগের ন্যায় কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিয়া গৃহে ফিরিয়া "মা, সাধুরা আমাকে কেমন সাজাইয়া দিয়াছেন, দেখ" বলিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল তখন চন্দ্রা দেবীর মন বিষম উদ্বিগ্ন হইল। তিনি ভাবিলেন, সাধুরা তাঁহার পুত্রকে কোনও দিন ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া যাইবে না ত? উক্ত আশঙ্কার কথা গদাধরকে বলিয়া তিনি একদিন নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বালক উহাতে তাঁহাকে নানাভাবে আশ্বস্তা করিয়াও শান্ত করিতে পারিল না। তখন সাধুদিগের নিকটে আর কখনও যাইবে না বলিয়া সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল এবং জননীকে ঐকথা বলিয়া নিশ্চিন্তা করিল। অনন্তর

সাধুদিগের সহিত মিলনে চন্দ্রা দেবীর আশঙ্কা ও তন্নিরসন।

গদাধরের কৈশোরকাল।

পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে গদাধর শেষ বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য সাধুদিগের নিকটে উপস্থিত হইল এবং ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে জননীর আশঙ্কার কথা নিবেদন করিল। তাঁহারা তাহাতে শ্রীমতী চন্দ্রার নিকটে বালকের সহিত আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া বলিলেন যে গদাধরকে ঐরূপ সঙ্গে লইবার সঙ্কল্প তাঁহাদিগের মনে কখনও উদিত হয় নাই এবং পিতামাতার অনুমতি ব্যতিরেকে ঐরূপ অল্পবয়স্ক বালককে সঙ্গে লওয়া তাঁহারা অপহরণরূপ সাধুবিগর্হিত বিষম অপরাধ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। চন্দ্রা দেবীর মনে তাহাতে পূর্ব্বাশঙ্কার ছায়া মাত্র রহিল না এবং সাধুদিগের প্রার্থনায় তিনি বালককে তাঁহাদিগের নিকটে পূর্ব্বের ন্যায় যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

গদাধরের দ্বিতীয়বার ভাবসমাধি।

এই কালের অন্য একটি ঘটনাতেও শ্রীমতী চন্দ্রা গদাধরের জন্য বিষম চিন্তিতা হইয়াছিলেন। ঐ ঘটনা সহসা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সকলে ধারণা করিলেও বুঝা যায় বালকের ভাবপ্রবণতা এবং চিন্তাশীলতা প্রবৃদ্ধ হইয়াই উহাকে আনয়ন করিয়াছিল। কামারপুকুরের এক ক্রোশ আন্দাজ্ উত্তরে অবস্থিত আনুর নামক গ্রামের সুপ্রসিদ্ধা দেবী ৺বিশালাক্ষীকে একদিন দর্শন করিতে যাইয়া পথিমধ্যে সে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া গিয়াছিল। ধর্ম্মদাস লাহার পূতস্বভাব কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী সেদিন বালকের ঐরূপ অবস্থা ভাবাবেশে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চন্দ্রা দেবী কিন্তু ঐ কথা বিশ্বাস না

করিয়া উহা বায়ুরোগ হইতে বা অন্য কোন কারণে হইয়াছে বলিয়া চিন্তিতা হইয়াছিলেন।* বালক কিন্তু এবারও পূর্ব্বের ন্যায় বলিয়াছিল যে, ৺ দেবীর চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপাদ পদ্মে মন লয় হইয়াই তাহার ঐরূপ অবস্থার উদয় হইয়াছিল।

গদাধরের স্যাঙাৎ গয়াবিষ্ণু।

ঐরূপে দুই বৎসরের অধিক কাল অপগত হইল এবং বালক ক্রমে পিতার অভাব ভুলিয়া নিজ দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখে ব্যাপৃত থাকিতে অভ্যস্ত হইল। গদাধরের পিতৃবন্ধু শ্রীযুত ধর্ম্মদাস লাহার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার পুত্র গয়াবিষ্ণুর সহিত বালকের এইকালে সৌহৃদ্য উপস্থিত হইয়াছিল। একত্র পাঠ ও বিহারে বালকদ্বয় পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া ক্রমে পরস্পরকে স্যাঙাৎ বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিল এবং প্রতিদিন অনেক সময় একত্র কাটাইতে লাগিল এবং পল্লীবাসিনী রমণীগণ গদাধরকে পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহে বাটীতে আহ্বান ও ভোজন করাইবার কালে সে এখন নিজ স্যাঙাৎকে সঙ্গে লইতে কখন ভুলিত না। বালকের ধাত্রী কামারকন্যা ধনী মিষ্টান্ন মোদকাদি সযত্নে প্রস্তুত করিয়া তাহাকে উপহার প্রদান করিলে সে স্যাঙাৎকে উহার অংশ প্রদান না করিয়া কখনও ভোজন করিত না। বলা বাহুল্য শ্রীযুত ধর্ম্মদাস এবং গদাধরের অভিবাবকেরা বালকদ্বয়ের মধ্যে ঐরূপ সখ্য দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, গদাধর নবম বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে

* এই ঘটনার সবিস্তার বৃত্তান্তের জন্য "সাধকভাব"—২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

দেখিয়া শ্রীযুত রামকুমার এখন তাহার উপনয়নের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কামারকন্যা ধনী ইতিপূর্ব্বে এক সময়ে বালকের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিল, সে যেন উপনয়নকালে তাহার নিকট হইতে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাকে মাতৃসম্বোধনে কৃতার্থ করে। বালকও তাহাতে তাহার অকৃত্রিম স্নেহে মুগ্ধ হইয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল। দরিদ্রা ধনী তাহাতে বালকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তদবধি যথাসাধ্য অর্থাদি সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিয়া সাগ্রহে ঐ কালের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেই কাল উপস্থিত দেখিয়া গদাধর এখন নিজ অগ্রজকে ঐকথা নিবেদন করিল। কিন্তু বংশে কখনও ঐরূপ প্রথার অনুষ্ঠান না হওয়ায় শ্রীযুত রামকুমার উহাতে আপত্তি করিয়া বসিলেন। বালকও নিজ অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া ঐ বিষয়ে বিষম জেদ করিতে লাগিল। সে বলিল ঐরূপ না করিলে তাহাকে সত্যভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে এবং মিথ্যাবাদী ব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত যজ্ঞসূত্র ধারণে কখন অধিকারী হইতে পারে না। উপনয়নের কাল সন্নিকট দেখিয়া ইতিপূর্ব্বেই সকল বিষয়ের আয়োজন করা হইয়াছিল, বালকের পূর্ব্বোক্ত জেদে ঐ কর্ম্ম পণ্ড হইবার উপক্রম হইল। ক্রমে ঐ কথা শ্রীযুত ধর্ম্মদাস লাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইয়া দিতে যত্নপর হইয়া তিনি শ্রীযুত রামকুমারকে বলিলেন, ঐরূপ অনুষ্ঠান তাঁহাদিগের বংশে ইতিপূর্ব্বে না হইলেও উহা অন্যত্র বহু সদ্ব্রাহ্মণপরিবারে দেখা গিয়া থাকে। অতএব উহাতে তাঁহাদিগের যখন নিন্দাভাগী

গদাধরের উপনয়নকালের বৃত্তান্ত।

হইতে হইবে না তখন বালকের সন্তোষ ও শান্তির জন্য ঐরূপ করিতে দোষ নাই। প্রবীণ পিতৃসুহৃৎ ধর্ম্মদাসের কথায় তখন রামকুমার প্রভৃতি ঐ বিষয়ে আর আপত্তি করিলেন না এবং গদাধর হৃষ্টচিত্তে যথাবিধানে উপবীত ধারণ করিয়া সন্ধ্যা পূজাদি ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। কামারকন্যা ধনীও তখন বালকের সহিত ঐ ভাবে সম্বদ্ধা হইয়া আপনার জীবন ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিল। উহার স্বল্পকাল পরেই বালক দশম বর্ষে পদার্পণ করিল।

পণ্ডিত সভায় গদাধরে প্রশ্ন-সমাধান।

উপনয়ন হইবার কিছুকাল পরে একটি ঘটনায় গদাধরের অসাধারণ দিব্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া পল্লীবাসী সকলে যারপর নাই বিস্মিত হইয়াছিল।* গ্রামের জমীদার লাহা বাবুদের বাটীতে কোনও বিশেষ শ্রাদ্ধবাসরে এক মহতী পণ্ডিতসভা আহূত হইয়াছিল এবং পণ্ডিতগণ ধর্ম্মবিষয়ক কোন জটিল প্রশ্নের সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিয়া সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেছিলেন না। বালক গদাধর ঐ সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ের এমন সুমীমাংসা করিয়া দিয়াছিল যে পণ্ডিতগণ তচ্ছ্রবণে তাহার ভূয়সী প্রশংসা ও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, উপনয়ন হইবার পরে গদাধরের ভাবপ্রবণ হৃদয় নিজ প্রকৃতির অনুকূল অন্য এক বিষয় অবলম্বনের অবসর পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিল। পিতাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া জীবন্ত বিগ্রহ ৺রঘুবীর কিরূপে কামারপুকুরের ভবনে প্রথমে উপস্থিত

* এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য "গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ"—৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

হইয়াছিলেন, তাঁহার শুভাগমনের দিবস হইতে লক্ষ্মীজলার ক্ষুদ্র জমীখণ্ডে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইয়া কিরূপে সংসারের অভাব দূরীভূত হইয়াছিল এবং করুণাময়ী চন্দ্রা দেবী অতিথি অভ্যাগত-দিগকেও নিত্য অন্নদানে সমর্থা হইয়াছিলেন, ঐ সকল কথা শুনিয়া বালক পূর্ব্ব হইতেই উক্ত গৃহদেবতাকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। সেই দেবতাকে স্পর্শ ও পূজা করিবার অধিকার এখন হইতে প্রাপ্ত হইয়া বালকের হৃদয় নবানুরাগে পূর্ণ হইয়াছিল। সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া সে এখন নিত্য তাঁহার পূজা ও ধ্যানে বহুক্ষণ অতিবাহিত করিতে লাগিল এবং যাহাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া পিতার ন্যায় তাহাকেও সময়ে সময়ে দর্শন ও আদেশ দানে কৃতার্থ করেন তজ্জন্য বিশেষ নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। রামেশ্বর শিব এবং ৺শীতলামাতাও বালকের ঐ সেবার অন্তর্ভুক্ত হইলেন। ঐরূপ সেবা পূজার ফলও উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইল না। বালকের পূত হৃদয় উহাতে একাগ্র হইয়া স্বল্পকালেই তাহাকে ভাবসমাধি বা সবিকল্প সমাধির অধিকারী করিল। এবং ঐ সমাধিসহায়ে তাহার জীবনে নানা দিব্যদর্শনও সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐরূপ সমাধি ও দর্শনের প্রথম বিকাশ এই বৎসর শিবরাত্রিকালে তাহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল। * বালক

গদাধরের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিণতি ও তৃতীয়বার ভাবসমাধি।

* "সাধকভাব—" দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। 'সাধকভাব' পুস্তকের এই ঘটনার সবিস্তার বিবরণে 'গয়াবিষ্ণু'র স্থলে ভ্রমক্রমে 'গঙ্গাবিষ্ণু' নাম এবং পাইনদের বাটীর কর্ত্তার নাম 'রসিক লাহা' লিখিত হইয়াছে। পাঠক উহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

সেদিন যথারীতি উপবাসী থাকিয়া বিশেষ নিষ্ঠার সহিত দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিতেছিল। তাহার বন্ধু গয়াবিষ্ণু এবং অন্য কয়েক জন বয়স্যও সেদিন ঐ উপলক্ষে উপবাসী ছিল এবং প্রতিবেশী গৃহস্থ সীতানাথ পাইনদের বাটীতে শিবমহিমাসূচক যাত্রার অভিনয় হইবে জানিয়া উহা শুনিয়া রাত্রি জাগরণ করিতে মনস্থ করিয়াছিল। প্রথম প্রহরের পূজা সমাপ্ত করিয়া গদাধর যখন তন্ময় হইয়া বসিয়াছিল তখন সহসা তাহার বয়স্যগণ আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল, পাইনদের বাটীতে যাত্রায় তাহাকে শিব সাজিয়া কয়েকটি কথা বলিতে হইবে। কারণ যাত্রার দলে যে শিব সাজিত সে পীড়িত হইয়া ঐ ভূমিকা গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছে। বালক উহাতে পূজার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া আপত্তি করিলেও তাহারা কিছুতেই ছাড়িল না। বলিল, শিবের ভূমিকা গ্রহণ করিলে তাহাকে সর্ব্বক্ষণ শিবচিন্তাই করিতে হইবে, উহা পূজা করা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে; অধিকন্তু ঐরূপ না করিলে কত লোকের আনন্দের হানি হইবে তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত; তাহারা সকলেও উপবাসী রহিয়াছে এবং ঐরূপে রাত্রি-জাগরণে ব্রত পূর্ণ করিবে, মনস্থ করিয়াছে। গদাধর অগত্যা সম্মত হইয়া শিবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসরে নামিয়াছিল। কিন্তু জটা, রুদ্রাক্ষ ও বিভূতি-ভূষিত হইয়া সে শিবের চিন্তায় এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে তাহার কিছুমাত্র বাহ্যসংজ্ঞা ছিল না। পরে বহুক্ষণ অতীত হইলেও তাহার চেতনা হইল না দেখিয়া সে-রাত্রির মত যাত্রা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

এখন হইতে গদাধরের ঐরূপ সমাধি মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইতে

লাগিল। ধ্যান করিবার কালে এবং দেবদেবীর মহিমাসূচক সঙ্গীতাদি শুনিতে শুনিতে সে এখন হইতে তন্ময় হইয়া যাইত এবং তাহার চিত্ত স্বল্প বা অধিক ক্ষণের জন্য নিজাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বহির্বিষয়-সকল গ্রহণে বিরত থাকিত। ঐ তন্ময়তা যে দিন প্রগাঢ় হইত সেই দিনই তাহার বাহ্যসংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইয়া সে জড়ের ন্যায় কিছুকাল অবস্থান করিত। ঐ অবস্থা নিবৃত্তির পরে কিন্তু সে জিজ্ঞাসিত হইলে বলিত, যে দেব অথবা দেবীর ধ্যান বা সঙ্গীতাদি সে শ্রবণ করিতেছিল তাঁহার সম্বন্ধে অন্তরে কোনরূপ দিব্য দর্শন লাভ করিয়া সে আনন্দিত হইয়াছে। চন্দ্রা দেবী প্রমুখ পরিবারস্থ সকলে উহাতে অনেক দিন পর্য্যন্ত সাতিশয় ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু উহাতে বালকের স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র হানি হইতে না দেখিয়া এবং তাহাকে সর্ব্বকর্ম্মকুশল হইয়া সদানন্দে কাল কাটাইতে দেখিয়া তাঁহাদিগের ঐ আশঙ্কা ক্রমে অপগত হইয়াছিল। বারংবার ঐরূপ অবস্থার উদয় হওয়ায় বালকেরও ক্রমে উহা অভ্যস্ত এবং প্রায় ইচ্ছাধীন হইয়া গিয়াছিল এবং উহার প্রভাবে তাহার সূক্ষ্ম বিষয়সকলে দৃষ্টি প্রসারিত এবং দেবদেবীবিষয়ক নানা তত্ত্ব উপলব্ধি হওয়ায় উহার আগমনে সে আনন্দিত ভিন্ন কখনও শঙ্কিত হইত না। সে যাহা হউক, বালকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এখন হইতে বিশেষ ভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং সে হরিবাসর, শিবের ও মনসার গাজন, ধর্ম্মপূজা প্রভৃতি গ্রামের যেখানে যে ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে লাগিল সেখানেই উপস্থিত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিতে লাগিল। বালকের মহদুদার ধর্ম্মপ্রকৃতি তাহাকে বিভিন্ন দেবদেবীর

গদাধরের পুনঃ পুনঃ ভাব-সমাধি লাভ।

উপাসকদিগের প্রতি বিদ্বেষশূন্য করিয়া তাহাদিগকে এখন হইতে আপনার করিয়া লইল। গ্রামের প্রচলিত প্রথা তাহাকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কারণ, বিষ্ণুপাসক, শিবভক্ত, ধর্ম্মপূজক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ অন্য গ্রামসকলের ন্যায় না হইয়া এখানে পরস্পরের প্রতি দ্বেষশূন্য হইয়া বিশেষ সদ্ভাবে বসবাস করিত।

গদাধরের বিদ্যার্জ্জনে উদাসীনতার কারণ।

ঐরূপে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিণতি হইলেও কিন্তু গদাধরের বিদ্যাভ্যাসে অনুরাগ এখন প্রবৃদ্ধ হয় নাই। পণ্ডিত ও ভট্টাচার্য্যাদি উপাধি-ভূষিত ব্যক্তিসকলের ঐহিক ভোগসুখ ও ধনলালসা দেখিয়া সে বরং তাঁহাদিগের ন্যায় বিদ্যার্জ্জনে দিন দিন উদাসীন হইয়াছিল। কারণ, বালকের সূক্ষ্মদৃষ্টি তাহাকে এখন সকল ব্যক্তির কার্য্যের উদ্দেশ্য নিরূপণে প্রথমেই অগ্রসর করিত এবং তাহার পিতার বৈরাগ্য, ঈশ্বরভক্তি, এবং সত্য, সদাচার ও ধর্ম্মপরায়ণতাদি গুণসকলকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগের আচরণের মূল্য নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত করিত। ঐরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বালক সংসারে প্রায় সকল ব্যক্তিরই অন্যরূপ উদ্দেশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। আবার অনিত্য সংসারকে নিত্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারা সর্ব্বদা দুঃখে মুহ্যমান হয় দেখিয়া সে ততোধিক বিমর্ষও হইয়াছিল। ঐরূপ দেখিয়া শুনিয়া ভিন্নভাবে নিজ জীবন পরিচালিত করিতে যে, তাহার মনে সঙ্কল্পের উদয় হইবে ইহা বিচিত্র নহে। পাঠক হয় ত পূর্ব্বোক্ত কথাসকল শুনিয়া বলিবেন, একাদশ বা দ্বাদশবর্ষীয় বালকের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচারশক্তির অতদূর

বিকাশ হওয়া কি সম্ভবপর? উত্তরে বলা যাইতে পারে, সাধারণ বালকসকলের ঐরূপ হয় না সত্য; কিন্তু গদাধর ঐ শ্রেণীভুক্ত ছিল না। অসাধারণ প্রতিভা, মেধা ও মানসিক সংস্কারসমূহ লইয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং অল্প বয়স হইলেও তাহার পক্ষে ঐরূপ কার্য্য বিচিত্র নহে। সেজন্য ঐরূপ হওয়া আমাদিগের নিকটে যেরূপই প্রতীয়মান হউক না কেন, আমরা অনুসন্ধানে ঘটনা যেরূপ জানিয়াছি সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে উহা তদ্রূপই বলিয়া যাইতে হইবে।

সে যাহা হউক, প্রচলিত বিদ্যাভ্যাসে ক্রমশঃ উদাসীন হইতে থাকিলেও গদাধর এখনও পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিতরূপে পাঠশালায় যাইতেছিল এবং মাতৃভাষায় লিখিত মুদ্রিত গ্রন্থ-সকল পড়িতে এবং লিখিতে বিশেষ পটু হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ রামায়ণ, মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থসকল সে এখন ভক্তির সহিত এমন সুন্দর-ভাবে পাঠ করিত যে, লোকে তচ্ছ্রবণে মুগ্ধ হইত। গ্রামের সরলচিত্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা সেজন্য তাহার মুখে ঐ সকল গ্রন্থ শ্রবণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত। বালকও তাহাদিগের তৃপ্তিসম্পাদনে কখনও পরাঙ্মুখ হইত না। ঐরূপে সীতানাথ পাইন, মধু যুগী প্রভৃতি অনেকে ঐজন্য তাহাকে নিজ নিজ বাটীতে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইত এবং স্ত্রী পুরুষ সকলে মিলিত হইয়া তাহার মুখে প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুবোপাখ্যান অথবা রামায়ণ-মহাভারতাদি হইতে অন্য কোন উপাখ্যান ভক্তিভরে শ্রবণ করিত।

গদাধরের শিক্ষা এখন কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল।

রামায়ণ-মহাভারতাদি ভিন্ন কামারপুকুরে, এতদঞ্চলের প্রসিদ্ধ

দেব-দেবীদিগের প্রকট কাহিনীসমূহ গ্রাম্য কবিদিগের দ্বারা সরল পদ্যে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রচলিত আছে। ঐরূপে ৺তারকেশ্বর মহাদেবের প্রকট হইবার কথা, যোগাদ্যার পালা, বন-বিষ্ণুপুরের ৺মদনমোহনজীর উপাখ্যান প্রভৃতি অনেক দেব দেবীর অলৌকিক চরিত্র এবং সাধু ভক্তদিগের নিকট স্বস্বরূপ প্রকাশ করিবার বৃত্তান্ত সময়ে সময়ে গদাধরের শ্রবণগোচর হইত। বালক নিজ শ্রুতিধরত্বগুণে ঐ সকল শুনিয়া আয়ত্ত করিয়া রাখিত এবং ঐরূপ উপাখ্যানের মুদ্রিত গ্রন্থ বা পুঁথি পাইলে কখন কখন উহা স্বহস্তে লিখিয়াও লইত। গদাধরের স্বহস্তলিখিত রামকৃষ্ণায়ণ পুঁথি, যোগাদ্যার পালা, সুবাহুর পালা প্রভৃতি আমরা কামারপুকুরের বাটীতে অনুসন্ধানে দেখিতে পাইয়া ঐ বিষয় জানিতে পারিয়াছিলাম। ঐ সকল উপাখ্যানও যে, বালক অনুরুদ্ধ হইয়া গ্রামের সরলচিত্ত নরনারীর নিকটে এই কালে বহুবার অধ্যয়ন ও আবৃত্তি করিত, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গণিতশাস্ত্রে বালকের উদাসীনতার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু পাঠশালায় যাইয়া সে ঐ বিষয়েও উন্নতি সাধন করিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, ধারাপাতে কাঠাকিয়া পর্য্যন্ত এবং পাটীগণিতে তেরিজ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য সামান্য গুণ ভাগ পর্য্যন্ত তাহার শিক্ষা ঐ বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু দশম বর্ষে উপনীত হইয়া ধ্যানের পরিণতিতে যখন তাহার মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বোক্তভাবে সমাধি উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন তাহার অগ্রজ রামকুমার প্রমুখ বাটীর সকলে তাহার বায়ুরোগ হইয়াছে ভাবিয়া তাহাকে যখন ইচ্ছা পাঠশালায় যাইতে এবং যাহা ইচ্ছা

শিখিতে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন এবং ঐ জন্য কোন বিষয়ে তাহার শিক্ষা অগ্রসর হইতেছে না দেখিলেও শিক্ষক উহার জন্য তাহাকে কখনও পীড়ন করেন নাই। সুতরাং গদাধরের পাঠশালার শিক্ষা যে, এখন হইতে বিশেষ অগ্রসর হইল না, একথা বলিতে হইবে না।

রামেশ্বর ও সর্ব্বমঙ্গলার বিবাহ।

ঐরূপে দুই বৎসর কাল অতীত হইল এবং গদাধর ক্রমে দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হইল। তাহার মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর এখন দ্বাবিংশতি বর্ষে এবং কনিষ্ঠা ভগিনী সর্ব্বমঙ্গলা নবমে পদার্পণ করিল। শ্রীযুত রামকুমার রামেশ্বরকে বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া কামারপুকুরের নিকটবর্ত্তী গৌরহাটি নামক গ্রামের শ্রীযুত রামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগিনীর সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন এবং রামসদয়কে নিজ ভগিনী সর্ব্বমঙ্গলার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। ঐরূপে রামেশ্বরের পরিবর্ত্তে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হওয়ায় কন্যাপক্ষীয়দিগকে পণ দিবার জন্য শ্রীযুত রামকুমারকে ব্যস্ত হইতে হইল না। রামকুমারের পারিবারিক জীবনে এই সময়ে অন্য একটি বিশেষ ঘটনাও উপস্থিত হইয়াছিল। যৌবনের অবসানেও তাঁহার সহধর্ম্মিণী গর্ভধারণ না করায় সকলে তাঁহাকে বন্ধ্যা বলিয়া এতকাল নিরূপণ করিয়াছিল। তাঁহাকে এখন গর্ভবতী হইতে দেখিয়া পরিবারবর্গের মনে আনন্দ ও শঙ্কার যুগপৎ উদয় হইল। কারণ, গর্ভধারণ করিলেই তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইবে একথা তাঁহাদিগের কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বে রামকুমারের নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, পত্নীর গর্ভধারণের কাল হইতে শ্রীযুত রামকুমারের ভাগ্যচক্রে বিশেষ পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইল।

গর্ভবতী হইয়া রামকুমার-পত্নীর স্বভাবের পবিবর্ত্তন।

যে সকল উপায়ে তিনি এতদিন বেশ অর্জ্জন করিতেছিলেন সে সকলে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাগম হইতে লাগিল না এবং তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্যও এখন হইতে ভঙ্গ হইয়া তিনি আর পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্মঠ রহিলেন না। তাঁহার পত্নীর আচরণসকলও এখন যেন ভিন্নাকার ধারণ করিল। তাঁহার পূজ্যপাদ পিতার সময় হইতে সংসারে নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল যে, অনুপনীত বালক এবং পীড়িত ব্যক্তি ভিন্ন কেহ কখনও ৺রঘুবীরের পূজার পূর্ব্বে জলগ্রহণ করিবে না। তাঁহার পত্নী এখন ঐ নিয়ম ভঙ্গ করিতে লাগিলেন এবং অমঙ্গলাশঙ্কা করিয়া বাটীর অন্য সকলে ঐবিষয়ে প্রতিবাদ করিলে তিনি তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সামান্য সামান্য বিষয়সকল অবলম্বন করিয়া তিনি পরিবারস্থ সকলের সহিত বিবাদ ও মনোমালিন্য উপস্থিত করিতে লাগিলেন এবং শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী ও নিজ স্বামী রামকুমারের কথাতেও ঐরূপ বিপরীতাচরণসকল হইতে নিরস্তা হইলেন না। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় ভাবিয়া তাঁহারা ঐ সকল আচরণের বিরুদ্ধে আর কিছু না বলিলেও কামারপুকুরের ধর্ম্মের সংসারে এখন ঐরূপে শান্তির পরিবর্ত্তে অনেক সময়ে অশান্তির উদয় হইতে থাকিল।

আবার, শ্রীযুত রামকুমারের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর এখন কৃতবিদ্য হইলেও বিশেষ উপার্জ্জনক্ষম হইয়া উঠিলেন না। সুতরাং

পরিবারবর্গের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত আয়ের হ্রাস হইয়া সংসারে পূর্ব্বের ন্যায় সচ্ছলতা রহিল না। শ্রীযুত রামকুমার ঐজন্য চিন্তিত হইয়া নানা উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত থাকিয়াও ঐ বিষয়ের প্রতীকার করিতে সমর্থ হইলেন না। কে যেন ঐ সকল উপায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া উহাদিগকে ফলবান হইতে দিল না। ঐরূপে চিন্তার উপর চিন্তা আসিয়া রামকুমারের জীবন ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল এবং দিন, পক্ষ, মাস অতীত হইয়া ক্রমে তাঁহার পত্নীর প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া তিনি নিজ পূর্ব্ব দর্শন স্মরণপূর্ব্বক অধিকতর বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন।

রামকুমারের সাংসারিক অবস্থা পরিবর্ত্তন।

ক্রমে ঐ কাল সত্যসত্যই উপস্থিত হইল এবং শ্রীযুত রামকুমারের সহধর্ম্মিণী সন ১২৫৫ সালের কোন সময়ে এক পরম রূপবান তনয় প্রসবান্তে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সূতিকাগৃহেই স্বর্গারোহণ করিলেন। রামকুমারের দরিদ্র সংসারে ঐ ঘটনায় শোকের নিবিড় যবনিকা পুনরায় নিপতিত হইল।

রামকুমার-পত্নীর পুত্র-প্রসবান্তে মৃত্যু।

অষ্টম অধ্যায়।

যৌবনের প্রারম্ভে।

পত্নী পরলোকে গমন করিলেন, কিন্তু রামকুমারের দুঃখদুর্দ্দিনের অবসান হইল না। বিদায় আদায় কমিয়া যাওয়ায় অর্থের অভাবে তাঁহার সাংসারিক অবস্থার দিন দিন অবনতি হইতে লাগিল। লক্ষ্মীজলার জমীখণ্ডে পর্য্যাপ্ত ধান্য এখনও উৎপন্ন হইলেও বস্ত্রাদি অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পদার্থসকলের অভাব সংসারে প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তদুপরি তাঁহার বৃদ্ধা মাতার ও মাতৃহীন শিশু অক্ষয়ের জন্য এখন নিত্য দুগ্ধের প্রয়োজন। সুতরাং ঋণ করিয়া ঐ সকল প্রয়োজন সাধিত হইত লাগিল, এবং ঋণজালের প্রতিদিন বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইল না। অশেষ চিন্তা ও নানা উপায় অবলম্বন করিয়াও রামকুমার উহা প্রতিরোধে অসমর্থ হইলেন। তখন বন্ধুবর্গের পরামর্শে অন্যত্র গমন করিলে আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত মনও উহাতে সাহ্লাদে সম্মতি দান করিল। কারণ, প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল যাঁহাকে জীবন-সঙ্গিনী করিয়া সংসার পাতিয়াছিলেন তাঁহার স্মৃতি যে গৃহের সর্ব্বত্র বিজড়িত রহিয়াছে, সেই গৃহ হইতে দূরে থাকিলেই এখন শান্তিলাভের সম্ভাবনা। সুতরাং কলিকাতা বা বর্দ্ধমান কোথায় যাইলে অধিক অর্থাগমের সম্ভাবনা এই বিষয়ে পরামর্শ

রামকুমারের কলিকাতায় টোল খোলা।

চলিতে লাগিল। পরিশেষে স্থির হইল প্রথমোক্ত স্থানে যাওয়াই কর্ত্তব্য। কারণ, শিহড় গ্রামের মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেশড়ার রামধন ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার পরিচিত অনেক ব্যক্তি কলিকাতা যাইয়া উপার্জ্জনের সুবিধা লাভ করিয়া নিজ নিজ সংসারের বেশ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে—একথা তাঁহার বন্ধুগণ নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল ব্যক্তিরা যে তাঁহা অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রবলে অনেকাংশে হীন, একথাও তাঁহারা তাঁহাকে বলিতে ভুলিলেন না। সুতরাং পত্নীবিয়োগের স্বল্পকাল পরেই শ্রীযুত রামকুমার রামেশ্বরের উপর সংসারের ভারার্পণ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন এবং ঝামাপুকুর নামক পল্লীর ভিতর টোল খুলিয়া ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাইতে নিযুক্ত হইলেন।

রামকুমার-পত্নীর মৃত্যুতে পারিবাবিক পরিবর্ত্তন।

রামকুমারের পত্নীর মৃত্যুতে কামারপুকুরের পারিবারিক জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। শ্রীমতী চন্দ্রা ঐ ঘটনায় গৃহকর্ম্মের সমস্ত ভার পুনরায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। রামকুমার-পুত্র অক্ষয়ের লালনপালনের ভারও ঐ দিন হইতে তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল। তাঁহার মধ্যম পুত্র রামেশ্বরের পত্নী তাঁহাকে ঐ সকল কর্ম্মে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিল; কিন্তু সে তখনও নিতান্ত বালিকা, তাহার নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং ৺রঘুবীরের সেবা, অক্ষয়ের লালনপালন এবং রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম, সকলই তাঁহাকে এখন করিতে হইত। ঐ সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে তাঁহার সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত, বিশ্রামের জন্য তিলার্দ্ধ অবসর

থাকিত না। আটান্ন বৎসর বয়ঃক্রমে * সংসারের সমস্ত ভার ঐরূপে স্কন্ধে লওয়া সুখসাধ্য না হইলেও শ্রীশ্রীরঘুবীরের ঐরূপ ইচ্ছা বুঝিয়া চন্দ্রা দেবী উহা বিনা অভিযোগে বহন করিতে লাগিলেন।

অন্য দিকে সংসারের আয়ব্যয়ের ভার শ্রীযুত' রামেশ্বরের উপর এখন হইতে নিপতিত হওয়ায় তিনি কিরূপে উপার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গকে সুখী করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ের চিন্তায় ব্যাপৃত রহিলেন। কিন্তু কৃতবিদ্য হইলেও তিনি কোনকালে বিশেষ উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা শ্রবণ করি নাই। তদুপরি পরিব্রাজক সাধু ও সাধকগণকে দেখিতে পাইলে তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে অনেককাল অতিবাহিত করিতেন এবং তাঁহাদিগের কোনরূপ অভাব দেখিলে উহা মোচন করিতে অনেক সময়ে অতিরিক্ত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সুতরাং আয় বৃদ্ধি হইলেও তাঁহার দ্বারা সংসারের ঋণ পরিশোধ অথবা বিশেষ সচ্ছলতা সম্পাদিত হইল না। কারণ, সংসারী হইলেও তিনি সঞ্চয়ী হইতে পারিলেন না এবং সময়ে সময়ে আয়ের অধিক ব্যয় করিয়া "৺রঘুবীর কোনরূপে চালাইয়া দিবেন" ভাবিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

রামেশ্বরের কথা।

* শ্রীমতী চন্দ্রা সন ১১৯১ সালে জন্মগ্রহণ এবং সন ১২৮২ সালে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। "সাধকভাবে"র পরিশিষ্টের ৮ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে লিখিত হইয়াছে—তিনি সন ১২৮২ সালের ১৬ই ফাল্গুন, ৯০।৯৫ বৎসরে দেহত্যাগ করেন। পাঠক উহা এই ভাবে সংশোধন করিয়া লইবেন—সন ১২৮২ সালে ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে চন্দ্রা দেবী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিদিবসে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

যৌবনের প্রারম্ভে।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিলেও শ্রীযুত রামেশ্বর তাহার শিক্ষাদি অগ্রসর হইতেছে কি না তদ্বিষয়ে কোনকালে লক্ষ্য করিতেন না। কারণ, একে ঐরূপ করা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল, তদুপরি অর্থচিন্তায় তাঁহাকে নানা স্থানে যাতায়াত করিতে হইত। সুতরাং ঐ বিষয় লক্ষ্য করিতে তাঁহার ইচ্ছা এবং সময় উভয় বস্তুরই এখন অভাব হইয়াছিল। আবার এই অল্প বয়সেই বালকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অদ্ভুত পরিণতি দেখিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, তাহার প্রকৃতি তাহাকে সুপথে ভিন্ন কখনও কুপথে পরিচালিত করিবে না। পল্লীর নরনারীসকলকে তাহার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে এবং তাহাকে পরমাত্মীয় বোধে ভালবাসিতে দেখিয়া তাঁহার ঐ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। কারণ, তিনি বুঝিতেন, বিশেষ সৎ এবং উদারচরিত্র না হইলে কেহ কখন সংসারে সকল ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করিয়া তাহাদিগের প্রশংসাভাজন হইতে পারে না। সেজন্য বালকের সম্বন্ধে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনাপূর্ব্বক তাঁহার হৃদয় আনন্দিত হইয়া উঠিত এবং তিনি সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকিতেন। সুতরাং রামকুমারের কলিকাতা গমনকালে গদাধর ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া এক প্রকার অভিভাবকশূন্য হইয়া পড়িল এবং তাহার উন্নত প্রকৃতি তাহাকে যেদিকে ফিরাইতে লাগিল, সে এখন অবাধে সেই পথেই চলিতে লাগিল।

গদাধরের সম্বন্ধে রামেশ্বরের চিন্তা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি গদাধরের সূক্ষ্মদৃষ্টি তাহাকে এই অল্প বয়সেই প্রত্যেক ব্যক্তির ও কার্য্যের উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিতে

গদাধরের মনের বর্ত্তমান অবস্থা ও কার্য্য কলাপ।

শিখাইয়াছিল। সুতরাং অর্থলাভে সহায়তা হইবে বলিয়াই যে, পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাসে এবং টোলে উপাধিভূষিত হইতে লোকে সচেষ্ট হয় ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। আবার, অশেষ আঁয়াস স্বীকারপূর্ব্বক সেই অর্থ উপার্জ্জন এবং উহা দ্বারা সাংসারিক ভোগসুখ লাভ করিয়া লোকে তাহার পিতার ন্যায় সত্যনিষ্ঠা, চরিত্রবল এবং ধর্ম্মলাভে সক্ষম হয় না, ইহাও সে দিন দিন দেখিতে পাইতেছিল। গ্রামের কোন কোন পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ স্বার্থসুখে অন্ধ হইয়া বিষয়সম্পত্তি লইয়া পরস্পর বিবাদ ও মামলা মোকদ্দমা উত্থাপনপূর্ব্বক গৃহ ও ক্ষেত্রাদিতে দড়ি ফেলিয়া "এই দিকটা আমার, ঐ দিকটা উহার" ইত্যাদি অংশ নিরূপণ করিয়া লইয়া কয়েক দিন ঐ বিষয় ভোগ করিতে না করিতেই শমনসদনে চলিয়া যাইল—ঐরূপ দৃষ্টান্তসকল কখনও কখনও অবলোকন করিয়া বালক বিশেষরূপে বুঝিয়াছিল, অর্থ ও ভোগলালসা মানবজীবনে অনেক অনর্থ উপস্থিত করে। সুতরাং অর্থকরী বিদ্যার্জ্জনে সে যে এখন দিন দিন উদাসীন হইবে এবং পিতার ন্যায় 'মোটা ভাত কাপড়ে' সন্তুষ্ট থাকিয়া ঈশ্বরের প্রীতিলাভকে মনুষ্য-জীবনের সারোদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিবে ইহা বিচিত্র নহে। সেজন্য বয়স্যদিগের প্রতি প্রেমে গদাধর পাঠশালায় প্রায় প্রতিদিন কোন না কোন সময়ে যাইলেও ৺রঘুবীরের সেবা-পূজায় এবং গৃহকর্ম্মে সাহায্যদানপূর্ব্বক মাতার পরিশ্রমের লাঘব করিয়া এখন হইতে তাহার অধিক কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। ঐ সকল বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত তাহাকে এখন প্রায়ই বাটীতে থাকিতে হইত।

যৌবনের প্রারম্ভে।

গদাধর ঐরূপে বাটীতে অধিক কাল অতিবাহিত করায় পল্লীরমণীগণের তাহার সহিত মিলিত হইবার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া তাঁহাদিগের অনেক অবসরকালে শ্রীমতী চন্দ্রার নিকটে উপস্থিত হইতেন এবং বালককে তথায় দেখিতে পাইয়া কখনও গান করিতে এবং কখন ধর্ম্মোপাখ্যানসকল পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন। বালকও তাঁহাদিগের ঐ সকল অনুরোধ যথাসাধ্য পালন করিতে যত্নপর হইত। চন্দ্রা দেবীকে গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিবার জন্য তাহার অবসরের অভাব দেখিলে তাঁহারা আবার সকলে মিলিয়া শ্রীমতী চন্দ্রার কর্ম্মসকল করিয়া দিয়া তাহার মুখে পুরাণকথা ও সঙ্গীতাদি শুনিবার অবসর করিয়া লইতেন। ঐরূপে তাঁহাদিগের নিকটে কিছুক্ষণ পাঠ ও সঙ্গীত করা গদাধরের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে অন্যতম হইয়া উঠিয়াছিল। রমণীগণও উহাতে এত আনন্দ অনুভব করিতেন যে, উহা অধিকক্ষণ শুনিবার আশয়ে তাঁহারা এখন হইতে নিজ নিজ গৃহকর্ম্মসকল শীঘ্র শীঘ্র সমাপ্ত করিয়া চন্দ্রা দেবীর নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

পল্লীরমণীগণের নিকটে গদাধরের পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনাদি।

গদাধর ইঁহাদের নিকটে শুদ্ধ পুরাণ পাঠ মাত্রই করিত না। কিন্তু অন্য নানা উপায়ে ইঁহাদিগের আনন্দ সম্পাদন করিত। গ্রামে ঐ সময়ে তিন দল যাত্রা, একদল বাউল এবং দুই এক দল কবি ছিল; তদ্ভিন্ন বহু বৈষ্ণব এথানে বসতি করায় অনেক গৃহেই প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভাগবত পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হইত। বাল্যকাল হইতে শ্রবণ করায় এবং নিজ স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভায় ঐ সকল দলের

পালা, গান ও সঙ্কীর্ত্তন সকল গদাধরের আয়ত্ত ছিল। সেজন্য রমণীগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে সে কোন দিন যাত্রার পালা, কোন দিন বাউলের গীতাবলী, কোন দিন কবি এবং কোন দিন বা সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিত। যাত্রার পালা বলিবার কালে সে ভিন্ন ভিন্ন স্বরে বিভিন্ন ভূমিকার কথাসকল উচ্চারণপূর্ব্বক একাকাই সকল চরিত্রের অভিনয় করিত। আবার নিজ জননী বা রমণীদিগের মধ্যে কাহাকেও কোন দিন বিমর্ষ দেখিলে সে ঐসকল যাত্রার সঙ্গের পালা অথবা সকলের পরিচিত গ্রামের কোন ব্যক্তির বিচিত্র আচরণ ও হাবভাবের এমন স্বাভাবিক অনুকরণ করিত যে, তাঁহাদিগের মধ্যে হাস্য ও কৌতুকের তরঙ্গ ছুটিত।

পল্লীরমণীগণের গদাধরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস।

সে যাহা হউক, গদাধর ঐরূপে ইঁহাদিগের হৃদয়ে ক্রমে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বালকের জন্মগ্রহণকালে তাহার জনকজননী যে সকল অদ্ভুত স্বপ্ন ও দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন, সে সকলের কথা ইঁহারা ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। আবার দেবদেবীর ভাবাবেশে সময়ে সময়ে তাঁহার যেরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব অবস্থান্তর উপস্থিত হয় তাহাও তাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার জ্বলন্ত দেবভক্তি, তন্ময় হইয়া পুরাণ পাঠ, মধুর কণ্ঠে সঙ্গীত এবং তাঁহাদিগের প্রতি আত্মীয়ের ন্যায় সরল উদার আচরণ যে, তাঁহাদিগের কোমল হৃদয়ে এখন অপূর্ব্ব ভক্তি ভালবাসার উদয় করিবে ইহা বিচিত্র নহে। আমরা শুনিয়াছি, ধর্ম্মদাস লাহার কন্যা প্রসন্নময়ী প্রমুখ বর্ষীয়সী রমণীগণ বালকের ভিতরে বালগোপালের দিব্য প্রকাশ অনুভব করিয়া তাহাকে পুত্রের

অধিক স্নেহ করিতেন; এবং তদপেক্ষা স্বল্পবয়স্কা রমণীগণ তাহাকে ঐরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশসম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহার সহিত সখ্যভাবে সম্বদ্ধা হইয়াছিলেন। রমণীগণের অনেকেই বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সরল কবিতাময় বিশ্বাসই তাঁহা-দিগের ধর্ম্মজীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল, সুতরাং অশেষ গুণসম্পন্ন প্রিয়দর্শন বালককে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করা তাঁহাদিগের পক্ষে বিচিত্র ছিল না। সে যাহা হউক, ঐরূপ বিশ্বাসে তাঁহারা এখন গদাধরের সহিত মিলিতা হইয়া তাহাকে নিঃসঙ্কোচে আপনাপন মনের কথা খুলিয়া বলিতেন এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। গদাধরও তাঁহাদিগের সহিত এমন ভাবে মিলিত হইত যে, অনেক সময়ে তাহাকে তাঁহাদিগের রমণী বলিয়া মনে হইত।*

রমণীবেশে গদাধর।

গদাধর কথন কথন রমণীর বেশভূষা ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে বিশেষ বিশেষ নারীচরিত্রের অভিনয় করিত। ঐরূপে শ্রীমতী রাধারাণীর অথবা তাঁহার প্রধানা সখী বৃন্দার ভূমিকা গ্রহণ করিবার কালে তাঁহারা তাহাকে অনেক সময় রমণীর বেশভূষায় সজ্জিত হইতে অনুরোধ করিতেন। বালকও তাঁহাদিগের ঐ অনুরোধ রক্ষা করিত। ঐ সময়ে তাহার হাব ভাব, কথাবার্ত্তা, চাল চলন প্রভৃতি অবিকল নারীর ন্যায় হইত। রমণীগণ উহা দেখিয়া

---

* সম্পূর্ণরূপে রমণীগণের ন্যায় হইবার বাসনা শ্রীযুত গদাধরের প্রাণে এই কালে কত প্রবল হইয়াছিল তাহা "সাধকভাবে"র চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ কথা হইতে পাঠক সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

বলিতেন, নারী সাজিলে গদাধরকে পুরুষ বলিয়া কেহই চিনিতে পারে না। উহাতে বুঝিতে পারা যায় বালক নারীগণের প্রত্যেক কার্য্য কত তন্ন তন্ন করিয়া ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছিল। রঙ্গপ্রিয় বালক এই সময়ে কোন কোন দিন রমণীর ন্যায় বেশভূষা করিয়া কক্ষে কলসী ধারণপূর্ব্বক পুরুষদিগের সম্মুখ দিয়া হালদারপুকুরে জল আনয়নে গমন করিয়াছিল এবং কেহই তাহাকে ঐবেশে চিনিতে পারে নাই।

গ্রামের ধনী গৃহস্থ সীতানাথ পাইনদের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সীতানাথের সাত পুত্র ও আট কন্যা ছিল; এবং কন্যাগণ বিবাহের পরেও সীতানাথের ভবনে একান্নে অবস্থান করিতেছিল। শুনা যায়, সীতানাথের বহু গোষ্ঠীর জন্য প্রতিদিন দশখানি শিলে বাটনা বাটা হইত, রন্ধনকার্য্যে এত মসলার প্রয়োজন হইত! তদ্ভিন্ন সীতানাথের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের অনেকে আবার তাঁহার বাটীর পার্শ্বে বাটী করিয়া বাস করিয়াছিল। সে-জন্য কামারপুকুরের এই অংশ বণিকপল্লী নামে প্রসিদ্ধ ছিল; এবং উহা ক্ষুদিরামের বাটীর সন্নিকটে থাকায় বণিক-রমণীগণের অনেকে চন্দ্রা দেবীর নিকটে অবসরকালে উপস্থিত হইতেন; বিশেষতঃ আবার, সীতানাথের স্ত্রী ও কন্যাগণ। সুতরাং গদাধরের সহিত ইঁহাদিগের এখন বিশেষ সৌহৃদ্য উপস্থিত হইয়াছিল। ইঁহারা বালককে অনেক সময়ে নিজ ভবনে লইয়া যাইতেন, এবং রমণী সাজিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবে অভিনয়াদি করিতে অনুরোধ করিতেন। অভিভাবকগণের নিষেধে তাঁহাদিগের আত্মীয়া রমণীগণের

সীতানাথ পাইনের পবিবারবর্গের সহিত গদাধরের সৌহৃদ্য।

অনেকে তাঁহাদিগের বাটী ভিন্ন অন্যত্র যাইতে পারিতেন না এবং সেজন্য গদাধরের পাঠ ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ করা তাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটিত না বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা বালককে ঐরূপে নিজ ভবনে যাইতে নিমন্ত্রণ করিতেন। ঐরূপে যাঁহারা চন্দ্রা দেবীর নিকটে যাইতেন না, বণিকপল্লীর ভিতরে এমন অনেকগুলি রমণীও গদাধরের ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সে সীতানাথের ভবনে উপস্থিত হইলে তাঁহারা লোকমুখে সংবাদ পাইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক তাহার পাঠ শ্রবণে ও অভিনয়াদি দর্শনে আনন্দ উপভোগ করিতেন। বাটীর কর্ত্তা সীতানাথ গদাধরকে বিশেষ-রূপে ভালবাসিতেন, এবং বণিকপল্লীর অন্যান্য পুরুষেরাও তাহার সদ্গুণসকলের সহিত পরিচিত ছিলেন। সেজন্য তাঁহাদিগের রমণীগণ তাহার নিকটে ঐরূপে সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করে জানিয়াও তাঁহারা উহাতে আপত্তি করিতেন না।

বণিকপল্লীর দুর্গাদাস পাইন নামক এক ব্যক্তি কেবল ঐ বিষয়ে আপত্তি করিতেন এবং গদাধরকে স্বয়ং শ্রদ্ধা ভক্তি করিলেও অন্দরের কঠোর অবরোধ-প্রথা কাহারও জন্য কোন কালে শিথিল হইতে দিতেন না। তাঁহার অন্তঃপুরের কথা কেহ জানিতে সক্ষম নহে এবং তাঁহার বাটীর রমণীগণকে কেহ কখনও অবলোকন করে নাই—বলিয়া তিনি সীতানাথ-প্রমুখ তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকট সময়ে সময়ে অহঙ্কারও করিতেন। ফলতঃ সীতানাথপ্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহার ন্যায় কঠোর অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে হীন জ্ঞান করিতেন।

দুর্গাদাস একদিন তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকটে ঐরূপে

অহঙ্কার করিতেছিলেন, এমন সময়ে গদাধর তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক বলিলেন, "অবরোধপ্রথার দ্বারা রমণীগণকে কখন কি রক্ষা করা যায়, সৎশিক্ষা ও দেবভক্তি প্রভাবেই তাঁহারা সুরক্ষিত হন; ইচ্ছা করিলে আমি তোমার অন্দরের সকলকে দেখিতে ও সমস্ত কথা জানিতে পারি।" দুর্গাদাস তাহাতে অধিকতর অহঙ্কৃত হইয়া বলিলেন, "কেমন জানিতে পার, জান দেখি?" গদাধরও তাহাতে 'আচ্ছা দেখা যাইবে' বলিয়া সেদিন চলিয়া আসিল। পরে একদিন অপরাহ্ণে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বালক মোটা মলিন একখানি সাড়ী ও রূপার পৈঁছা প্রভৃতি পরিয়া দরিদ্রা তন্তুবায়-রমণীর ন্যায় বেশ ধারণপূর্ব্বক একটি চুবড়ি কক্ষে লইয়া ও অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে হাটের দিক হইতে দুর্গাদাসের ভবন-সম্মুখে উপস্থিত হইল। দুর্গাদাস বন্ধুবর্গের সহিত তখন বহির্ব্বাটীতেই বসিয়া ছিলেন। রমণীবেশধারী গদাধর তাঁহাকে তন্তুবায়রমণী গ্রামান্তর হইতে হাটে সূতা বেচিতে আসিয়া সঙ্গিনীগণ ফেলিয়া যাওয়ায়, বিপন্না বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিল এবং রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিল। দুর্গাদাস তাহাতে তাহার কোন্ গ্রামে বাস ইত্যাদি দুই একটি প্রশ্ন করিয়া উত্তর শ্রবণানন্তর বলিলেন, "আচ্ছা, অন্দরে স্ত্রীলোকদিগের নিকটে যাইয়া আশ্রয় লও।" গদাধর তাহাতে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অন্দরে প্রবেশ করিল এবং রমণীগণকে পূর্ব্বের ন্যায় আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক নানাবিধ বাক্যালাপে পরিতুষ্টা করিল। তাহার স্বল্প বয়স দেখিয়া এবং মধুর বাক্যে প্রসন্না হইয়া

দুর্গাদাস পাইনের অহঙ্কার চূর্ণ হওয়া।

দুর্গাদাসের অন্তঃপুরচারিণীরা তাহাকে থাকিতে দিলেন এবং তাহার বিশ্রামের স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়া জলযোগ করিবার জন্য মুড়ি মুড়কি প্রভৃতি প্রদান করিলেন। গদাধর তখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া উহা ভক্ষণ করিতে করিতে অন্দরের সকল ঘর ও প্রত্যেক রমণীকে তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিতে এবং তাঁহাদিগের পরস্পরের বাক্যালাপ শ্রবণ করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের বাক্যালাপে মধ্যে মধ্যে যোগদান এবং প্রশ্নাদি করিতেও সে ভুলিল না। ঐরূপে প্রায় এক প্রহর রাত্রি অতীত হইল। এদিকে এত রাত্রি হইলেও সে গৃহে ফিরিল না দেখিয়া চন্দ্রা দেবী রামেশ্বরকে তাহার অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন এবং বণিকপল্লীতে সে প্রায় যাইয়া থাকে জানিয়া তাহাকে তথায় অন্বেষণ করিতে বলিয়া দিলেন। রামেশ্বর সেজন্য প্রথমে সীতানাথের বাটীতে উপস্থিত হইয়া জানিলেন, বালক তথায় আসে নাই। অনন্তর দুর্গাদাসের ভবনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর শুনিতে পাইয়া গদাধর অধিক রাত্রি হইয়াছে বুঝিয়া দুর্গাদাসের অন্দর হইতে "দাদা, যাচ্চি গো" বলিয়া উত্তর দিয়া দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। দুর্গাদাস তখন সকল কথা বুঝিলেন এবং বালক তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে প্রতারণা করিতে সক্ষম হইয়াছে ভাবিয়া প্রথমে অপ্রতিভ ও কিছু রুষ্ট হইলেও পরক্ষণেই তাহার দরিদ্রা তন্তুবায় রমণীর বেশ ও চালচলনের অনুকরণ কতদূর স্বাভাবিক হইয়াছে ভাবিয়া হাসিতে লাগিলেন। সীতানাথ প্রমুখ দুর্গাদাসের আত্মীয়েরা পরদিন ঐ কথা জানিতে পারিয়া গদাধরের নিকটে

তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। এখন হইতে সীতানাথের ভবনে বালক উপস্থিত হইলে দুর্গাদাসের অন্তঃপুরচারিণীরাও তাহার নিকটে আসিতে লাগিলেন।

বণিকপল্লীর রমণীগণের গদাধরের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস।

সীতানাথের পরিবারবর্গ এবং বণিকপল্লীর অন্যান্য রমণীগণ ক্রমে গদাধরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বালক তাঁহাদিগের নিকটে কিছু দিন না আসিলেই তাঁহারা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। সীতানাথের ভবনে পাঠ ও সঙ্গীতাদি করিবার কালে গদাধরের কখন কখন ভাবাবেশ উপস্থিত হইত। তদ্দর্শনে রমণীগণের তাহার প্রতি ভক্তি বিশেষ প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি ঐরূপ ভাবসমাধিকালে তাঁহাদিগের অনেকে বালককে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণের জীবন্ত বিগ্রহজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন এবং অভিনয়কালে তাহার সহায়তা হইবে বলিয়া তাঁহারা একটি সুবর্ণনির্ম্মিত মুরলী ও স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রের অভিনয়-উপযোগী বিবিধ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

ধর্ম্মপ্রবণ পূতস্বভাব, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি, এবং সপ্রেম সরল ও অমায়িক ব্যবহারে গদাধর পল্লীরমণীগণের উপরে এইকালে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার বিবরণ আমরা তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও মুখে সময়ে সময়ে শুনিবার অবসর লাভ করিয়াছিলাম। সন ১২৯৯ সালের বৈশাখের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী প্রমুখ আমরা কয়েক জন কামারপুকুর দর্শনে গমন করিয়া সীতানাথ পাইনের কন্যা শ্রীমতী রুক্মিণীর সাক্ষাৎকার লাভ

করিয়াছিলাম। তাঁহার বয়স তখন আন্দাজ ষাট বৎসর হইয়াছিল। শ্রীযুত গদাধরের পূর্ব্বোক্ত প্রভাব সম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার এখানে উল্লেখ করিলে পাঠকের ঐ বিষয় স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। শ্রীমতী রুক্মিণী বলিয়াছিলেন—

গদাধরের সম্বন্ধে শ্রীমতী রুক্মিণীর কথা।

"আমাদের বাড়ী এখান হইতে একটু উত্তরে—ঐ দেখা যাইতেছে। আজ কাল আমাদের বাড়ীর ভগ্নাবস্থা, পরিবারবর্গ একরূপ নাই বলিলেই হয়। কিন্তু আমার বয়স যখন সতর, আঠার বৎসর ছিল, তখন বাড়ীটি দেখিলে লক্ষ্মীমন্তের বাড়ী বলিয়া বোধ হইত। আমার পিতার নাম ৺সীতানাথ পাইন। খুড়তুতো জাঠ্‌তুতো সকলকে ধরিয়া সর্ব্বশুদ্ধ, আমরা সতর, আঠারটি ভগ্নী ছিলাম এবং বয়সে পরস্পরে দুই পাঁচ বৎসরের ছোট-বড় হইলেও ঐকালে সকলেই যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলাম। গদাধর বাল্যকাল হইতে আমাদিগের সহিত একত্রে খেলা-ধূলা করিতেন। সেজন্য আমাদিগের সহিত তাঁহার খুব ভাব ছিল। আমরা যৌবনে পদার্পণ করিলেও তিনি আমাদের বাড়ীতে যাইতেন এবং ঐরূপে তিনি বড় হইবার পরেও আমাদিগের বাড়ীর অন্দরে যাতায়াত করিতেন। বাবা তাঁহাকে বড ভালবাসিতেন—আপনার ইষ্টের মত দেখিতেন ও ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। পাড়ায় কেহ কেহ তাঁহাকে বলিত, 'তোমার বাড়ীতে অতগুলি যুবতী কন্যা রহিয়াছে, গদাধরও এখন বড় হইয়াছে, তাহাকে এখনও অত বাড়ীর ভিতরে যাইতে দাও কেন?' বাবা তাহাতে বলিতেন, 'তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আমি গদাধরকে খুব চিনি।' তাহারা সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে

পারিত না। গদাধর বাড়ীর অন্দরে আসিয়া আমাদিগকে কত পুরাণকথা বলিতেন, কত রঙ্গ-পরিহাস করিতেন। আমরা প্রায় প্রতিদিন ঐ সকল শুনিতে শুনিতে আনন্দে গৃহকর্ম্মসকল করিতাম। তিনি যখন আমাদিগের নিকটে থাকিতেন তখন কত আনন্দে যে সময় কাটিয়া যাইত তাহা এক মুখে আর কি বলিব! যেদিন তিনি না আসিতেন সেদিন তাঁহার অসুখ হইয়াছে ভাবিয়া আমাদিগের মন ছট্ ফট্ করিত। সেদিন যতক্ষণ না আমাদিগের কেহ জল আনিবার বা অন্য কোন কর্ম্মের দোহাই দিয়া বামুন মার (চন্দ্রা দেবীর) সহিত দেখা করিয়া তাঁহার সংবাদ লইয়া আসিত ততক্ষণ আমাদিগের কাহারও প্রাণে শান্তি থাকিত না। তাঁহার প্রত্যেক কথাটি আমাদের অমৃতের ন্যায় বোধ হইত। সে জন্য তিনি যেদিন আমাদিগের বাড়ীতে না আসিতেন, সেদিন তাঁহার কথা লইয়াই আমরা দিন কাটাইতাম।"

পল্লীর পুরুষ-সকলের গদাধরের প্রতি অনুরক্তি।

কেবলমাত্র রমণীগণের সহিত ঐরূপে মিলিত হইয়াই গদাধর ক্ষান্ত ছিল না। কিন্তু তাহার সর্ব্বতোমুখী উদ্ভাবনী শক্তি এবং সকলের সহিত প্রেমপূর্ণ আচরণ তাহাকে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই সহিত মিলিত করিয়াছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গ্রামের বৃদ্ধ ও যুবকবৃন্দ যে সকল স্থলে মিলিত হইয়া ভাগবতাদি পুরাণপাঠ বা সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনাদিতে আনন্দ উপভোগ করিতেন তাহার সকল স্থলেই তাহার যাতায়াত ছিল। বালক ঐ সকল স্থলের যেখানে যেদিন উপস্থিত থাকিত সেখানে সেদিন আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হইত। কারণ, তাহার ন্যায় পাঠ ও ধর্ম্মতত্ত্বসকলের ভক্তিপূর্ণ

ব্যাখ্যা আর কেহই করিতে সক্ষম ছিল না। সঙ্কীর্ত্তনকালে তাহার ন্যায় ভাবোন্মত্ততা, তাহার ন্যায় নূতন নূতন ভাবপূর্ণ আখর দিবার শক্তি এবং তাহার ন্যায় মধুর কণ্ঠ ও রমণীয় নৃত্য আর কাহারও ছিল না। আবার, রঙ্গপরিহাস স্থলে তাহার ন্যায় সঙ্‌ দিতে, তাহার ন্যায় নরনারীর সকল প্রকার আচরণ অনুকরণ করিতে এবং তাহার ন্যায় নূতন নূতন গল্প ও গান যথাস্থলে অপূর্ব্বভাবে লাগাইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে অন্য কেহ সমর্থ হইত না। সুতরাং যুবক ও বৃদ্ধেরা সকলেই তাহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিলেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। বালকও সেজন্য কোন দিন এক স্থলে, কোন দিন অন্য স্থলে তাঁহাদিগের সহিত সমভাবে মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধিত করিত।

আবার এই বয়সেই বালক পরিণতবয়স্কের ন্যায় বুদ্ধি ধারণ করায় তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ সাংসারিক সমস্যা-সকলের সমাধানের জন্য তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ঐরূপে তাহার পূতস্বভাবে আকৃষ্ট হইয়া এবং ভগবৎ-নাম ও কীর্ত্তনে তাহার ভাবসমাধি হইতে দেখিয়া তাহার পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেন।* কেবল ভণ্ড ধূর্ত্তেরা তাহাকে দেখিতে পারিত না। কারণ গদাধরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাহাদিগের উপরের মোহনীয় আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদিগের গোপনীয় উদ্দেশ্যসকল ধরিয়া ফেলিত

* শুনা যায় শ্রীনিবাস শাঁখারি প্রমুখ কয়েক জন যুবক শ্রীযুত গদাধরকে এখন হইতে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি ও পূজা করিত।

এবং সত্যনিষ্ঠ স্পষ্টবাদী বালক অনেক সময়ে উহা সকলের নিকট কীর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে অপদস্থ করিত। শুদ্ধ তাহাই নহে, রঙ্গপ্রিয় গদাধর অনেক সময়ে অপরের নিকটে তাহাদিগের কপটাচরণের অনুকরণ করিয়াও বেড়াইত। উহার জন্য মনে মনে কুপিত হইলেও সকলের প্রিয়, নির্ভীক বালকের তাহারা কিছুই করিতে পারিত না। সেজন্য অনেক সময়ে শরণাগত হইয়া তাহাদিগকে গদাধরের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইত। কারণ, শরণাগতের উপর বালকের অশেষ করুণা সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইত।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, গদাধর এখনও প্রতিদিন কোন না কোন সময়ে পাঠশালায় উপস্থিত হইত এবং বয়স্যদিগের প্রতি প্রেমই তাহার ঐরূপ করিবার কারণ ছিল। বাস্তবিক চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিবার পর হইতে বালকের ভক্তি ও ভাবুকতা এত অধিক প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, পাঠশালার অর্থকরী শিক্ষা তাহার পক্ষে এককালে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তাহার নিকটে উপলব্ধি হইতেছিল। সে যেন এখন হইতেই অনুভব করিতেছিল, তাহার জীবন অন্য কার্য্যের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে এবং ধর্ম্মসাক্ষাৎকার করিতে তাহাকে তাহার সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। ঐ বিষয়ের অস্পষ্ট ছায়া তাহার মনে অনেক সময়ে উদিত হইত, কিন্তু উহা এখনও পূর্ণাবয়ব না হওয়ায় সে উহাকে সকল সময়ে ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হইত না। কিন্তু নিজ জীবন ভবিষ্যতে কি ভাবে পরিচালিত করিবে একথা তাহার মনে যখনই উদিত

গদাধরের অর্থকরী বিদ্যার্জ্জনে উদাসীনতার কারণ।

হইত তাহার বিচারশীল বুদ্ধি তাহাকে তখনই ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তাহার কল্পনাপটে গৈরিক বসন, পবিত্র অগ্নি, ভিক্ষালব্ধ ভোজন এবং নিঃসঙ্গ বিচরণের ছবি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিত। তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় কিন্তু তাহাকে পরক্ষণেই মাতা ও ভ্রাতাদিগের সাংসারিক অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া তাহাকে ঐ পথে গমনের অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে এবং নিজ পিতার ন্যায় নির্ভরশীল হইয়া সংসারে থাকিয়া তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে উত্তেজিত করিত। ঐরূপে বুদ্ধি ও হৃদয় তাহাকে ভিন্ন পথ নির্দ্দেশ করায় সে 'যাহা করেন ৺রঘুবীর' ভাবিয়া ঈশ্বরের আদেশলাভের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। কারণ বালকের প্রেমপূর্ণ হৃদয় একান্ত আপনার বলিয়া তাঁহাকেই ইতিপূর্ব্বে অবলম্বন করিয়াছিল। সুতরাং যথাকালে তিনিই ঐ প্রশ্ন সমাধান করিয়া দিবেন ভাবিয়া সে এখন অনেক সময়ে আপনাকে শান্ত করিত। ঐরূপে বুদ্ধি ও হৃদয়ের দ্বন্দ্বস্থলে তাহার বিশুদ্ধ হৃদয়ই পরিশেষে জয়লাভ করিত এবং উহার প্রেরণাতেই সে এখন সর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদন করিতেছিল।

অসাধারণ সহানুভূতি সম্পন্ন গদাধরের বিশুদ্ধ হৃদয় তাহাকে এখন হইতে অন্য এক বিষয়ও সময়ে সময়ে উপলব্ধি করাইতেছিল। পুরাণপাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনাদি সহায়ে উহা তাহাকে গ্রামের নরনারী-সকলের সহিত ইতিপূর্ব্বে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে এত আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে শিখাইয়াছিল যে, তাহাদিগের জীবনের সুখদুঃখাদি সে এখন হইতে সর্ব্বতোভাবে আপনার বলিয়া অনুভব করিতেছিল। সুতরাং তাহার বিচারশীল বুদ্ধি তাহাকে

এইকালে যখনই সংসার পরিত্যাগে ইঙ্গিত করিত তাহার হৃদয় তাহাকে তখনই ঐ সকল নরনারীর সরল প্রেমপূর্ণ আচরণের এবং তাহার প্রতি অসীম বিশ্বাসের কথা স্মরণ করাইয়া তাহাকে এমন ভাবে নিজ জীবন নিয়োজিত করিতে বলিত যদ্দর্শনে তাহারা সকলে নিজ নিজ জীবন পরিচালিত করিবার উচ্চাদর্শ লাভে কৃতার্থ হইতে পারে এবং তাহার সহিত তাহাদিগের বর্ত্তমান সম্বন্ধ যাহাতে সুগভীর পারমার্থিক সম্বন্ধে পরিণত হইয়া চিরকালের নিমিত্ত অবিনশ্বর হইতে পারে। বালকের স্বার্থগন্ধশূন্য হৃদয় তাহাকে ঐ বিষয়ের স্পষ্ট আভাষ প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে ঐ জন্য বলিতেছিল, 'আপনার জন্য সংসার ত্যাগ করা—সে ত স্বার্থপরতা; যাহাতে ইহারা সকলে উপকৃত হয় এমন কিছু কর।'

গদাধরের হৃদয়ের প্রেরণা।

পাঠশালায়, এবং পরে, টোলে বিদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে কিন্তু গদাধরের হৃদয় ও বুদ্ধি এখন মুক্তকণ্ঠে এক কথাই বলিতেছিল, কিন্তু সহসা পাঠশালা পরিত্যাগ করিলে বয়স্যগণ তাহার সঙ্গলাভে অনেকাংশে বঞ্চিত হইবে বলিয়াই সে ঐ কার্য্য এখনও করিতে পারিতেছিল না। কারণ, গয়াবিষ্ণুপ্রমুখ বালকের সমবয়স্ক সকলে তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, এবং তাহার অসাধারণ বুদ্ধি ও অসীম সাহস তাহাকে এখানেও দলপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই সময়ের একটি ঘটনায় বালক অর্থকরী বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করিবার সুযোগ-লাভ করিয়াছিল। গদাধরের অভিনয় করিবার শক্তি দেখিয়া তাহার কয়েক জন বয়স্য এখন একটি যাত্রার দল খুলিবার প্রস্তাব একদিন উত্থাপন করিল এবং তাহাদিগকে ঐ বিষয়ে শিক্ষাদানের



কামার পুকুরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মানিক রাজার প্রতিষ্ঠিত আম্রকানন।

ভার গদাধরকে লইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। গদাধরও ঐ বিষয়ে সম্মত হইল। কিন্তু অভিভাবকগণ জানিতে পারিলে ঐ বিষয়ে বাধা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা জানিয়া কোন্ স্থানে তাহারা ঐ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবে তদ্বিষয়ে বালকগণ চিন্তিত হইয়া পড়িল। গদাধরের উদ্ভাবনী শক্তি তখন তাহাদিগকে মাণিকরাজার আম্রকানন দেখাইয়া দিল, এবং স্থির হইল পাঠশালা হইতে পলায়ন করিয়া তাহারা প্রতিদিন সকলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ স্থানে উপস্থিত হইবে।

গদাধরের পাঠশালা পরিত্যাগ ও বয়স্যদিগের সহিত অভিনয়।

সঙ্কল্প শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইল এবং গদাধরের শিক্ষায় বালকগণ স্বল্প সময়ের ভিতরেই আপন আপন ভূমিকা ও গান সকল কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক যাত্রাভিনয়ে আম্র-কানন মুখরিত করিয়া তুলিল। অবশ্য, ঐ সকল যাত্রাভিনয়ের সকল অঙ্গই গদাধরকে নিজ উদ্ভাবনী শক্তিবলে সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হইত এবং উহাদিগের প্রধান চরিত্রের ভূমিকাসকল তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইত। যাহাই হউক, যাত্রার দল এক-প্রকার মন্দ গঠিত হইল না দেখিয়া বালকেরা পরম আনন্দলাভ করিয়াছিল এবং শুনা যায়, আম্রকাননে অভিনয় কালেও গদাধরের সময়ে সময়ে ভাবসমাধি উপস্থিত হইয়াছিল।

সঙ্কীর্ত্তন ও যাত্রাভিনয়ে গদাধরের অনেক কাল অতিবাহিত হওয়ায় তাহার চিত্রবিদ্যা এখন আর অধিক অগ্রসর হইতে পায় নাই। তবে শুনা যায়, গৌরহাটি গ্রামে তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলাকে বালক এই সময়ে একদিন দেখিতে গিয়াছিল

এবং বাটীতে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইয়াছিল তাহার ভগিনী প্রসন্নমুখে তাহার স্বামীর সেবা করিতেছে। উহা দেখিয়া সে অল্প দিন পরে তাহার ভগিনী ও তৎস্বামীর ঐ ভাবের একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, পরিবারস্থ সকলে উহাতে চিত্রগত প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়ের সহিত শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলার ও তৎস্বামীর নিকটসাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।

গদাধরের চিত্রবিদ্যা ও মূর্ত্তিগঠনে উন্নতি।

দেবদেবীর মূর্ত্তিসকল সংগঠনে কিন্তু গদাধর বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, তাহার ধর্ম্মপ্রবণ প্রকৃতি তাহাকে ঐ সকল মূর্ত্তি গঠনপূর্ব্বক বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে যথাবিধি পূজা করিতে অনেক সময়ে প্রযুক্ত করিত।

সে যাহা হউক, পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া গদাধর নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকলে নিযুক্ত থাকিয়া এবং চন্দ্রা দেবীকে গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিয়া কাল কাটাইতে লাগিল। মাতৃহীন শিশু অক্ষয়ও তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাকে অনেক সময় নিযুক্ত রাখিত। কারণ, চন্দ্রা দেবীকে গৃহকর্ম্মের অবসর দিবার জন্য ঐ শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করা এবং নানা ভাবে খেলা দিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখা এখন তাহার নিত্যকর্ম্মসকলের অন্যতম হইয়া উঠিয়াছিল। ঐরূপে তিন বৎসরের অধিক কাল অতীত হইয়া গদাধর ক্রমে সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল। ঐ তিন বৎসরের পরিশ্রমে শ্রীযুত রামকুমারের কলিকাতার চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহারও উপার্জ্জনের পূর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হইয়াছিল।

যৌবনের প্রারম্ভে।

কলিকাতায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিলেও শ্রীযুত রামকুমার বৎসরান্তে একবার কয়েক পক্ষের জন্য কামারপুকুরে আগমনপূর্ব্বক জননী ও ভ্রাতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধান করিতেন। গদাধরের বিদ্যার্জ্জনে উদাসীনতা ঐ অবসরে লক্ষ্য করিয়া তিনি এখন চিন্তিত হইয়াছিলেন। সে যেভাবে বর্ত্তমানে কাল কাটাইয়া থাকে তিনি তদ্বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান লইলেন এবং মাতা ও মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে কলিকাতায় নিজ সমীপে রাখাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া নিরূপণ করিলেন। ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত টোলের গৃহকর্ম্মও অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল; সেজন্য ঐ সকল বিষয়ে সাহায্য করিতে একজন লোকের অভাবও তিনি ঐ সময়ে বোধ করিতেছিলেন। অতএব স্থির হইল যে, গদাধর কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে ঐ সকল বিষয়ে কিছু কিছু সাহায্য দান করিবে এবং অন্যান্য ছাত্রগণের ন্যায় তাঁহারই নিকটে বিদ্যাভ্যাস করিবে। গদাধরের নিকটে ঐ প্রস্তাব উপস্থিত হইলে পিতৃতুল্য অগ্রজকে সাহায্য করিতে হইবে জানিতে পারিয়া সে কলিকাতা গমনে কিছুমাত্র আপত্তি করিল না। অনন্তর শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রীযুত রামকুমার ও গদাধর ৺ রঘুবীরকে প্রণামপূর্ব্বক চন্দ্রা দেবীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। কামারপুকুরের আনন্দের হাট কিছু কালের জন্য ভাঙ্গিয়া যাইল এবং শ্রীমতী চন্দ্রা ও গদাধরের প্রতি অনুরক্ত নরনারীসকলে তাহার মধুময় স্মৃতি ও ভাবী উন্নতির চিন্তা করিয়া কোনরূপে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কলিকাতায়

গদাধরের সম্বন্ধে রামকুমারের চিন্তা ও তাহাকে কলিকাতায় আনয়ন।

আগমন করিবার পরে শ্রীযুত গদাধর যে সকল অলৌকিক চেষ্টা করিয়াছিলেন পাঠক সে সকল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের 'সাধকভাব' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন পর্ব্ব সম্পূর্ণ।



পরিশিষ্ট।

পুস্তকস্থ ঘটনাবলীর সময় নিরূপক তালিকা।

সাল	খৃষ্টাব্দ	ঘটনা
১১৮১	১৭৭৫	—শ্রীযুত ক্ষুদিরামের জন্ম।
১১৯৭	১৭৯১	—শ্রীমতী চন্দ্রা দেবীর জন্ম।
১২০৫	১৭৯৯	—শ্রীমতী চন্দ্রা দেবীর সহিত শ্রীযুত ক্ষুদিরামের বিবাহ—ক্ষুদিরামের বয়স ২৪ বৎসর ও চন্দ্রা দেবীর বয়স ৮ বৎসর। [সন ১২৮২ সালে ৮৫ বৎসর বয়সে চন্দ্রা দেবীর মৃত্যু।]
১২১১	১৮০৫	—শ্রীযুত রামকুমারের জন্ম। অতএব রামকুমার ঠাকুরের অপেক্ষা ৩১ বৎসরের বড়।
১২১৬	১৮১০	—শ্রীমতী কাত্যায়নীর জন্ম।
১২২০	১৮১৪	—শ্রীযুত ক্ষুদিরামের কামারপুকুরে আসিয়া বাস করা। তখন ক্ষুদিরামের বয়স ৩৯ বৎসর।
১২২৬	১৮২০	—রামকুমারের ও কাত্যায়নীর বিবাহ।
১২৩০	১৮২৪	—শ্রীযুত ক্ষুদিরামের ৺ রামেশ্বর যাত্রা।
১২৩২	১৮২৬	—শ্রীযুত রামেশ্বরের জন্ম। অতএব তিনি ঠাকুরের অপেক্ষা ১০ বৎসরের বড়।
১২৪০	১৮৩৪	—২৪ বৎসর বয়সে কাত্যায়নীর শরীরে ভূতাবেশ।
১২৪১	১৮৩৫	—শ্রীযুত ক্ষুদিরামের ৺ গয়া দর্শন। তখন তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর।

১২৪২ ১৮৩৬—৬ই ফাল্গুন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে।

১২৪৫ ১৮৩৯—সর্ব্বমঙ্গলার জন্ম।

১২৪৯ ১৮৪৩—শ্রীযুত ক্ষুদিরামের দেহত্যাগ, ৬৮ বৎসর বয়সে। তখন ঠাকুরের বয়স ৭ বৎসর।

১২৫৪ ১৮৪৮—রামেশ্বর ও সর্ব্বমঙ্গলার বিবাহ।

১২৫৫ ১৮৪৯—শ্রীযুত রামকুমারের পুত্র অক্ষয়ের জন্মান্তে ৩৬ বৎসর বয়সে তৎপত্নীর মৃত্যু। তখন রামকুমারের বয়স ৪৪ বৎসর।

১২৫৬ ১৮৫০—শ্রীযুত রামকুমারের কলিকাতায় টোল খোলা।

১২৫৯ ১৮৫৩—ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন ও ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীতে বাস।

১২৬২ ১৮৫৬—দক্ষিণেশ্বর কালিবাটী প্রতিষ্ঠা।

১২৬৩ ১৮৫৭—শ্রীযুত রামকুমারের মৃত্যু (৫২ বৎসর বয়সে)।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

পাঁচ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে

পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন,

গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ,

সাধকভাব

ও

ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ

(স্বামী সারদানন্দ প্রণীত)

গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ—১।০ ; গ্রাহকপক্ষে ১৲। উত্তরার্দ্ধ—১৷৷০ ; গ্রাহকপক্ষে ১৶০। সাধকভাব—১৷৷০ ; উদ্বোধন গ্রাহকপক্ষে ১৶০। পূর্ব্বকথা ও বাল্য-জীবন—৸৶০ ; উদ্বোধন-গ্রাহকপক্ষে ৸০। দিব্যভাব—১৷৷০ ; উদ্বোধন-গ্রাহকপক্ষে ১।/০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে এরূপ ভাবের পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। যে সার্ব্বজনীন উদার আধ্যাত্মিক শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়া স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ-প্রমুখ বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে জগদ্‌গুরু ও যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইয়াছিলেন, সে ভাবটি বর্ত্তমান পুস্তক ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া অসম্ভব; কারণ ইহা তাঁহাদেরই অন্যতমের দ্বারা লিখিত। পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিষয়গুলি ঐ পৃষ্ঠার পার্শ্বে মার্জিন্যাল নোটরূপে দেওয়া হইয়াছে।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ

তৃতীয় সংস্করণ।

বর্ত্তমান পুস্তকখানি পড়িতে বসিলে পাঠক দেখিবেন, স্বামিজী যেন সাক্ষাৎ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন এবং সকল প্রকার কঠিন বিষয়ের যথাযথ মীমাংসাগুলি বুঝাইয়া দিতেছেন। স্বামিজী ও তাঁহার মতামত জানিবার এমন সুযোগ পাঠক ইতিপূর্ব্বে আর কখন পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। বেলুড় রামকৃষ্ণ-মঠের প্রাচীন সান্ন্যাসিবর্গের অন্যতম শ্রীসারদানন্দ স্বামী পুস্তকখানির আদ্যন্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

পুস্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে স্বামিজীর একখানি আচার্য্যবেশের ছবি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে স্বামিজীর গুরুভ্রাতৃগণের সহিত একখানি গ্রূপ ছবি ও স্বামিজীর অন্য একখানি বাষ্ট ছবি আছে। প্রতি খণ্ড ৸৵০ আনা।

শ্রীরামানুজ চরিত

শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রণীত।

শ্রীসম্প্রদায়ে প্রচলিত আচার্য্য রামানুজের বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার এমন তদ্ভাব-ভাবিত ও রসগ্রাহী হইয়া তুলিকা ধরিয়াছেন যে, বঙ্গসাহিত্যে আচার্য্যের যোগ্য পরিচয় দিবার জন্য যে আমরা যোগ্য লেখক পাইয়াছিলাম, তাহা পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

গ্রন্থের মলাট সুন্দর কাপড়ে বাঁধান এবং প্রাচীন দ্রাবিড়ী পুঁথির পাটার মত নানা বর্ণে চিত্রিত। আচার্য্য রামানুজের জীবদ্দশায় খোদিত প্রতিমূর্ত্তি ও গ্রন্থকারের প্রতিমূর্ত্তি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য—২৲ টাকা।

